বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা

বুদ্ধদেব বসুর

শ্রেষ্ঠ কবিতা
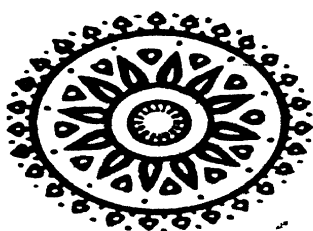
নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

কোনো-এক স্বাক্ষরশিকারী রবীন্দ্রনাথকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলো: 'আপনার মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বই কোনটি?' উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'Nature abhors superlatives.' এক বিশেষ অর্থে এই কথাটা সত্য। চরমের নির্দিষ্ট নমুনা জড় প্রকৃতিতে পাওয়া যায়; পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, সবচেয়ে গভীর সমুদ্র— এগুলোর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহেই আছে, কিন্তু মানুষের চিন্ময় প্রকৃতি যেখানে সক্রিয়, সেখানে ভালো-মন্দের তারতম্য থাকলেও চরম ব'লে কিছু নেই, শ্রেষ্ঠ ব'লে কিছু নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখক কে, শ্রেষ্ঠ বই কোনটি, এ-সব বালোচিত প্রশ্নের যেমন কোনো উত্তর হয় না, তেমনি কোনো-একজন লেখকের শ্রেষ্ঠ বই কোনটি, বা শ্রেষ্ঠ কবিতা কোন-কোনটি, এ-বিষয়েও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজে কিছু কবুল করতে রাজি হবেন না। 'শ্রেষ্ঠ' কথাটা সমালোচনায় ব্যবহৃত হয় শুধু একটা সুবিধাজনক ব্যবস্থারূপে, কিংবা তার প্রয়োগের ক্ষেত্র সমালোচক এমনভাবে সীমাবদ্ধ ক'রে দেন যাতে কথাটার আক্ষরিক অর্থ— কিংবা অর্থহীনতার বদলে একটি স্পর্শসহ তাৎপর্য পাওয়া যায়। Nature-এর চেয়েও অনেক বেশি, Art abhors superlatives।

আমিও পাঠকদের অনুরোধ জানাই, এই গ্রন্থের নামকরণে 'শ্রেষ্ঠ' কথাটা তাঁরা যেন আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করেন। ওটা একটা চলতি কথা, ব্যবহারযোগ্য নাম মাত্র; এ-কবিতা কেন আছে, ও-কবিতা কেন নেই, এই তর্ক অনিবার্য হ'লেও শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল; আসল কথাটা এই যে এই গ্রন্থের ভিতর দিয়ে লেখককে ঠিক চেনা যাচ্ছে কিনা। অন্তত আমি সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি; 'বন্দীর বন্দনা'য় সতেরো বছর বয়সে প্রথম যখন আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছিলুম, সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত যে-সব কবিতায় আমার 'আমি' সত্য হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে ব'লে আমার মনে হয়, তা-ই থেকে সংকলন ক'রে এই গ্রন্থটি সাজিয়েছি। বিন্যাসে কালানুক্রমিক ব্যবস্থা রেখেছি, যাতে পরিণতির ধারাটা বোঝা যায়, তাছাড়া ভাবগত ও প্রকরণগত বৈচিত্র্যেরও উদাহরণ দিয়েছি— গ্রন্থের আয়তনের মধ্যে যতটা সম্ভব। সেইজন্য আমার ছোটোদের কবিতাও এর অন্তর্ভূত হয়েছে, এবং কিছু অনুবাদ— কবিতার অনুবাদে যে-সব সমস্যা দেখা দেয়, তার সমাধানে কবিদের একটি বিশেষ রকমের পরীক্ষা হয় ব'লে আমার বিশ্বাস। পরিশেষে পাঠকের কাছে নিবেদন এই যে এই সংকলনটিকে

তাঁরা যেন সংগ্রহ ব'লে ভুল না করেন; কোনো কবিকে সম্পূর্ণ ক'রে জানতে হ'লে তাঁর সমগ্র রচনাবলির সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজন, এই কথাটি ভুলে গেলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে।

কলকাতা
২২-১১-১৯৫২

বু. ব.

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র দ্বিতীয় সংস্করণ অনেকাংশে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হ'লো; অন্তর্বর্তী আট বছরে যে-সব নতুন কবিতা ও অনুবাদ-কবিতা প্রকাশ করেছি, তা থেকে সংকলন দিতে হ'লো ব'লে পূর্ব-সংস্করণের কিছু রচনা বর্জন করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু, যা বাদ গেছে তার তুলনায় বেশি রচনা যোগ করা হয়েছে; তাই আশা করি পাঠকের দিক থেকে কোনো অভিযোগ উঠবে না।

পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি হয়েছে 'অনুবাদ' অংশে; তার কারণ আমার সাম্প্রতিক অনুবাদকর্মের পরিমাণপ্রাচুর্য। এম. সি. সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত 'কালিদাসের মেঘদূত' গ্রন্থ থেকে যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনার অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত হ'লো, আর বোদলেয়ার থেকে যে-ক'টি অনুবাদ এখানে গ্রহণ করেছি তা 'শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভূত হবে— নাভানা সেটি প্রকাশ করবেন। এর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ্য: 'চুল' কবিতাটি বোদলেয়ার দু-বার লিখেছিলেন— প্রথমে পদ্যে ও পরে গদ্যে; গদ্যকবিতাটির অনুবাদ— যা প্রায় তিরিশ বছর আগে করেছিলাম— তা এই গ্রন্থে গৃহীত হ'লো, 'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর 'একমাথা চুল' কবিতার পদ্য-অনুবাদ পূর্বোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যাবে। প্রথম সংস্করণের 'আলবাট্রস' ও 'শব' বর্জন ক'রে সম্প্রতি-রচিত 'আলবাট্রস' ও 'এক শব' গ্রহণ করা হ'লো— আমার মতে এই দ্বিতীয় লেখন দুটি মূল কবির অভিপ্রায়ের নিকটতর।

'ডাক্তার জ়িভাগো' উপন্যাসের একটি বাংলা সংস্করণ বর্তমানে যন্ত্রস্থ; সেই পুস্তকে পাস্টেরনাক-এর 'প্রত্যুষ' ও 'একটি রূপকথা' সংকলিত হবে।

কলকাতা
৩০-৪-১৯৬০

বু. ব.

বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা
শাপভ্রষ্ট ১১
বন্দীর বন্দনা ১৪
প্রেমিক ১৮

পৃথিবীর পথে
অসূর্যম্পশ্যা ২৩
সুদূরিকা ২৩
আর-কিছু নাহি সাধ ২৪

কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা
কোনো মেয়ের প্রতি ২৫
একখানা হাত ২৬
কঙ্কাবতী ২৮
গান ৩২
আমন্ত্রণ— রমাকে ৩৩
মধ্যরাত্রে ৩৬
বিরহ ৩৭

নতুন পাতা
এই শীতে ৩৮
স্পর্শের প্রজ্বলন ৩৯
দেবতা দুই (অংশ) ৪০
জন্ম ৪১
এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে ৪১
দয়াময়ী মহিলা ৪২
চিল্কায় সকাল ৪৬
পাণ্ডুলিপি ৪৭
বৃষ্টি আর ঝড় ৪৮

দময়ন্তী
দময়ন্তী ৫০
ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা ৫৫
নির্মম যৌবন ৫৬
ম্যাল-এ ৫৮
সাগর-দোলা ৬১
ব্যাং ৬৩
ইলিশ ৬৪
জোনাকি ৬৫

দ্রৌপদীর শাড়ি
মায়াবী টেবিল ৬৮
দ্রৌপদীর শাড়ি ৬৮
রূপান্তর ৭০
কোনো মৃতার প্রতি ৭১
পৌষপূর্ণিমা ৭১
প্রত্যহের ভার ৭২
অন্য প্রভু ৭৩

শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর
মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে ৭৩
বর্ষার দিন ৮৩
কবিমশাই··· ৮৬
অসম্ভবের গান ৮৯
শীতরাত্রির প্রার্থনা ৯১
* রাত্রি ৯৬

যে-আঁধার আলোর অধিক
সমর্পণ ৯৮
স্মৃতির প্রতি : ১ ১০০
স্মৃতির প্রতি : ৩ ১০১
দায়িত্বের ভার ১০২
কোনো কুকুরের প্রতি ১০২
রবীন্দ্রনাথ ১০৩
রাত তিনটের সনেট : ১ ১০৪
আটচল্লিশের শীতের জন্য : ১ ১০৪
এক তরুণ কবিকে ১০৫
গ্যেটের অষ্টম প্রণয় ১০৬

অনুবাদ

* চুল : শার্ল বোদলেয়ার ১০৯
আলবাট্রস : " ১১০
এক শব : " ১১১
সুন্দর জাহাজ : " ১১৩
বিতৃষ্ণা ৩ : " ১১৫
সান্ধ্য প্রদোষ : " ১১৬

কোনো মালাবারের মেয়েকে : শার্ল বোদলেয়ার ১১৭
সিথেরায় যাত্রা : ,, ১১৮
স্তোত্র : ,, ১২১
* ভেনাসের জন্ম : রাইনের মারিয়া রিলকে ১২২
* হেমন্ত : ,, ১২৪
* অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট ১ : ৩ : ,, ১২৫
* মধ্যজীবন : ফ্রীডেরিখ হ্যেল্ডার্লিন ১২৬
* হাইপেরিয়নের অদৃষ্টের গান : ,, ১২৬
* দিওতিমার প্রতি : ,, ১২৭
* প্রত্যূষ : বরিস পাস্টেরনাক ১২৮
* একটি রূপকথা : ,, ১২৯
* বিষাদ-গাথা : এজ়রা পাউণ্ড ১৩৪
* অমরতার গান : ঐ অবলম্বনে ১৩৫
* যখন র'বো না আর মর্ত্য ছাঁচে : ই. ই. কামিংস ১৩৫
* হে সুন্দরী স্বতঃস্ফুট পৃথিবী কত বার : ,, ১৩৬
* নির্জন প্রাসাদ : ওয়ালেস স্টীভন্স ১৩৭
'মেঘদূতে' যক্ষপ্রিয়া (উত্তরমেঘ) : কালিদাস ১৩৮
* মৃতা পত্নীকে : য়ুয়ান চন ১৪১

ছোটোদের কবিতা

ামাসের ছড়া
রামধনু ১৪৫
ঘুমের সময় ১৪৮
পরিমল-কে ১৪৮
বারোমাসের ছড়া ১৫০
চম্পাবরন কন্যা ১৫২
রুমির পত্র— বাবাকে ১৫৩
পরি-মার পত্র— বাবাকে ১৫৬
পাপ্পার জন্মদিনে ১৫৯
সরস্বতী পুজোর পদ্য (টুটুর জন্য) ১৬১
হাওয়ার গান ১৬১

*-চিহ্নিত কবিতা ও অনুবাদ-কবিতা লেখকের অন্য কোনো কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূর্ত হয়নি।

শাপভ্রষ্ট

যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
ব'সে আছি আমি।
দগ্ধ স্বর্ণরেণুসম বালুকণারাশি
লুটায় চরণপ্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে।
ঊর্ধ্বে মম রক্তিম আকাশ—
প্রভাতসূর্যের লজ্জা রঞ্জিত করিছে অরণ্যানী।
সদ্য-নিদ্রা-জাগরিত গগনের পাণ্ডুভাল-'পরে
বহ্নিশিখা করিছে অর্পণ :
কামনার বহ্নি সে যে, স্বপনের সলজ্জ বিকাশ।
গোলাপের বর্ণে-বর্ণে স্বপ্নসুধা মাখা,
আরক্তিম কামনায় আঁকা।
আমার অন্তর নিয়ে একাকী বসিয়া আছি আমি
উচ্ছ্বসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে।

সম্মুখে গরজে সিন্ধু বেদনার দুঃসহ পীড়নে।
লক্ষ-লক্ষ লুব্ধ 'ওষ্ঠ মেলি'
চুম্বিয়া মুছিতে চাহে গগনের তরুণ রক্তিমা,
রিক্ত করি' দিতে চাহে ধরিত্রীর তীর্থযাত্রীদলে
সহসা-বন্যায়।
নিষ্ফল আক্রোশে তার ক্রূর জিহ্বা উদ্গারিছে বিষ,
তরঙ্গমথিত ফেনা রেখে যায় সৈকতশিয়রে।
গাঢ়কৃষ্ণ জলরাশি অস্বচ্ছ অতল
নিত্য-নব অমঙ্গলে করে জন্মদান
গোপন গভীর গর্ভে ;
অকল্যাণ বায়ু বহি' প্রাণের মন্দিরে
নির্বাপিত করি' দেয় পূজার প্রদীপ ;
ম্লানমুখে ঝরি' পড়ে কাননে অস্ফুট শেফালিকা
হিমস্পর্শে তার।

আমি শুষ্ক, নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি' মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গণ।
সুদূর কুসুমগন্ধে তার যাত্রাবাঁশি বেজে ওঠে ;
দৈন্যভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার।
—যৌবন আমার অভিশাপ।

ক্ষণে-ক্ষণে তরঙ্গের 'পরে
গগনের স্নিগ্ধ শান্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হ'য়ে যেন লাগে ;
ফুটে ওঠে সোনার কমল
ক্ষণিক সৌরভে তার নিখিলেরে করিয়া বিহ্বল।
সেই পদ্মগন্ধখানি এনে দেয় মোর পরিচয়
পল্লব-সম্পুটে।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি আমি লিখন তাহার :
'হে তরুণ, দস্যু নহো, পশু নহো, নহো তুচ্ছ কীট—
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !'

শাপভ্রষ্ট দেব আমি !
আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মতো
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি', শূন্যতায় উড়ি' যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।
তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লবমর্মর
প্রেমগুঞ্জনের মতো কী-অমৃত ঢালে মর্ম-মাঝে।
রবির গভীর স্নেহে, শিশিরের শীতল প্রণয়ে
শুষ্ক শাখে তাই ফোটে ফুল,
দক্ষিণ পবন তারে মৃদু হাস্যে আন্দোলিয়া যায়।
রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা,

আঁধারের অশ্রুকণা তারার মণিকা হ'য়ে জ্বলে
ত্রিযামার জাগরণতলে।
স্তব্ধ চিত্তে চেয়ে থাকি ; অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা
সযত্নে সাজাই নিত্য উৎসবের প্রদীপের মতো
আনন্দের মন্দির-সোপানে।
সুধায় নির্মিত মোর দেহসৌধখানি,
ইন্দ্রিয় তাহার বাতায়ন—
মুক্ত করি' রাখি' তারে আকাশের অকূল আলোকে
অন্ধকার-অন্তরালে অন্তরের মাঝে
বিনিঃশেষে করি যে গ্রহণ !

অক্ষম, দুর্বল আমি নিঃসম্বল নীলাম্বর-তলে,
ভঙ্গুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা—
জীবনের দীর্ঘ পথে যাত্রা করেছিনু কোন স্বর্ণরেখাদীপ্ত উষাকালে—
আজ তার নাহিকো আভাস।
আজ আমি ক্লান্ত হ'য়ে পথপ্রান্তে প'ড়ে আছি নীরব ব্যথায় শান্ত মুখে
ঝ'রে-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।
সেই মোর গোধূলির সুরভি আঁধারে
যার সাথে দেখা,
যার সাথে সংগোপনে প্রণয়গুঞ্জন,
যার স্পর্শে ক্ষণে-ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে
চমকিয়া খেলি' যায় হর্ষের বিজলি ;—
নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি,
দেখিয়াছি দিনে-দিনে, ক্ষণে-ক্ষণে আপনার ছায়া,
দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মতো অপরূপ,
ভাস্করের মতো জ্যোতির্ময় ;—
তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি,
নিষ্কলঙ্ক রবি।
তখন বিষন্ন বায়ু নিশ্বসি' কহিয়া গেছে কানে :
'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !'

নিকুঞ্জের সঙ্গী মোর হাসিয়া কয়েছে যবে কথা
তুচ্ছতম বাণী তার রূপান্তর করেছে গ্রহণ,
বিহঙ্গের উদাসীন কলকণ্ঠ-সাথে মিশি' আসি'
বেজেছে আমার বক্ষে তুরাশার মতো—
'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !'

তাই আজ ভাবি মনে-মনে—
পঙ্কের কলঙ্ক-বারি উত্তরিয়া আছে মোর স্থান
পঙ্কজের শুভ্র অঙ্কে।
শেফালি-সৌরভ আমি, রাত্রির নিশ্বাস,
ভোরের ভৈরবী।
সংসারের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণ্টকের তুচ্ছ উৎপীড়ন
হাস্যমুখে উপেক্ষিয়া চলি।
যেথা যত বিপুল বেদনা,
যেথা যত আনন্দের মহান মহিমা—
আমার হৃদয়ে তার নব-নব হয়েছে প্রকাশ!
বকুলবীথির ছায়ে গোধূলির অস্পষ্ট মায়ায়
অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।-
শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি !

বন্দীর বন্দনা

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রচেছো আমায়—
নির্মম নির্মাতা মম ! এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার !
মনে করি, মুক্ত হবো ; মনে ভাবি, রহিতে দিবো না
মোর তরে এ-নিখিলে বন্ধনের চিহ্নমাত্র আর।
রুক্ষ দস্যুবেশে তাই হাস্যমুখে ভেসে যাই উচ্ছ্বসিত স্বেচ্ছাচার-স্রোতে,
উপেক্ষিয়া চ'লে যাই সংসার-সমাজ-গড়া লক্ষ-লক্ষ ক্ষুদ্র কণ্টকের
নিষ্ঠুর আঘাত ; দাসত্বের স্নেহের সন্তান

সংস্কারের বুকে হানি তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় পরিহাস,
অবজ্ঞার কঠোর ভৎর্সনা।
মনে ভাবি, মুক্তি বুঝি কাছে এলো—
বিশ্বের আকাশে বহে লাবণ্যের মৃত্যুহীন স্রোত।

তারপরে একদিন অকস্মাৎ বিস্ময়ে নেহারি—
কোথা মুক্তি ?
সহস্র অদৃশ্য বাধা নিশিদিন ঘিরে আছে মোরে,
যতই এড়ায়ে চলি, ততই জড়ায়ে ধরে পায়ে,
রোধ করে জীবনের গতি।
সে-বন্ধন চলে মোর সাথে-সাথে জীবনের নিত্য অভিসারে
সুন্দরের মন্দিরের পানে।
সে-বন্ধন মগ্ন করি' রেখেছে আমারে
আকণ্ঠ পঙ্কের মাঝে।
সে-বন্ধন লক্ষ-লক্ষ লাঞ্ছনার বীজাণুতে
কলুষিত করিয়াছে নিশ্বাসের বাতাস আমার—
লোহিত শোণিত মম নীল হ'য়ে গেছে সে-বন্ধনে।
ক্ষণ-তরে নাহি মুক্তি ; কর্ম-মাঝে, মর্ম-মাঝে মোর,
প্রতি স্বপ্নে, প্রতি জাগরণে,
প্রতি দিবসের লক্ষ বাসনা-আশায়
আমারে রেখেছো বেঁধে অভিশপ্ত, তপ্ত নাগপাশে
সৃজন-উষার আদি হ'তে—
উদাসীন স্রষ্টা মোর !
মুক্তি শুধু মরীচিকা— সুমধুর মিথ্যার স্বপন,
আপনার কাছে মোরে করিয়াছো বন্দী চিরন্তন।

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি ;—

তাদের মেটাতে হয় আত্ম-বঞ্চনার নিত্য ক্ষোভ।
আছে ক্রূর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় স্বার্থপর লোভ,
হিরণ্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে।
আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা।
সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে-ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়,
কাঁদায় আমারে সদা অপমানে ব্যথায়, লজ্জায়।
ভুলিয়া থাকিতে চাই ;— ক্ষণ-তরে ভুলে যাই ডুবে গিয়ে লাবণ্য-উচ্ছ্বাসে-
তবু, হায়, পারি না ভুলিতে।
নিমেষে-নিমেষে ত্রুটি, পদে-পদে স্খলন-পতন,
আপনারে ভুলে যাওয়া— সুন্দরের নিত্য অসম্মান।
বিশ্বস্রষ্টা, তুমি মোরে গড়েছো অক্ষম করি' যদি,
মোরে ক্ষমা করি' তব অপরাধ করিয়ো ক্ষালন।

জ্যোতির্ময়, আজি মম জ্যোতির্হীন বন্দীশালা হ'তে
বন্দনা-সংগীত গাহি তব।
স্বর্গলোভ নাহি মোর, নাহি মোর পুণ্যের সঞ্চয়,
লাঞ্ছিত বাসনা দিয়া অর্ঘ্য তব রচি আমি আজি :
শাশ্বত সংগ্রামে মোর আহত বক্ষের যত রক্তাক্ত ক্ষতের বীভৎসতা,
হে চিরসুন্দর, মোর নমস্কার-সহ লহো আজি।

বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না-হয় ডুবিয়া আছি ক্রমিঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হ'য়ে আছে তবু।
না-হয় রেখেছো বেঁধে ; তবু জেনো, শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর
উধাও আগ্রহভরে ঊর্ধ্বনভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে।
মোর আঁখি রহে জাগি' নিস্তব্ধ নিশীথে,

আপন আসন পাতে নিদ্রাহীন নক্ষত্রসভায়,
স্বচ্ছ শুক্ল ছায়াপথে মায়ারথে ভ্রমি' ফেরে কভু
আবেশ-বিভ্রমে।
তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি-সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।
তাই মোর দেহ যবে ভিক্ষুকের মতো ঘুরে মরে
ক্ষুধাজীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কাল—
সমস্ত অন্তর মম সে-মুহূর্তে গেয়ে ওঠে গান
অনন্তের চির-বার্তা নিয়া;
সে কেবল বার-বার অসীমের কানে-কানে একটি গোপন বাণী কহে—
'তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি!'
রক্তমাঝে মদ্যফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন,
শিরায়-শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ,
লোলুপ লালসা করে অন্যমনে রসনালেহন।
তবু আমি অমৃতাভিলাষী!—
অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি,
ভালোবাসি— আর-কিছু নয়।
তুমি যারে সৃজিয়াছো, ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি,
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ।
বিশ্বের মাধুর্য-রস তিলে-তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি;—তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে-মহাসৃজন-কালে— তুমি শুধু জানো সেই কথা।

মোর আপনারে আমি নবজন্ম করিয়াছি দান।
নিখিলের স্রষ্টা তুমি, তোমার উদ্দেশে আজি তাই,
মোর এই সৃষ্টিকার্য উৎসৃষ্ট করিনু সন্তর্পণে।
মোর এই নব সৃষ্টি— এ যে মূর্ত বন্দনা তোমার,
অনাদির মিলিত সংগীত।
আমি কবি, এ-সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর—

তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,
এই গর্ব মোর।
লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেলো হানি'
তোমার সকাশে।

প্রেমিক

নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে কুৎসিত কঙ্কাল-
(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত-পীত বর্ণ তার : খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী—
জানি, সে কিসের মূর্তি। নিঃশব্দ, বীভৎস এক রুক্ষ অট্টহাসি—
নিদারুণ দন্তহীন বিভীষিকা।
নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে সেই
কঠিন কাঠামো ;
হরিণ-শিশুর মতো করুণ আঁখির অন্তরালে
ব্যাধিগ্রস্ত উন্মাদের দুঃস্বপ্ন যেমন।

তবু ভালোবাসি।
নতুন ননীর মতো তব তনুখানি
স্পর্শিতে অগাধ সাধ, সাহস না পাই।
সিন্ধুগর্ভে ফোটে যত আশ্চর্য কুসুম
তার মতো তব মুখ, তার পানে তাকাবার ছল
খুঁজে নাহি পাই।
মনে করি কথা কবো : আকুলিবিকুলি করে কত কথা রক্তের ঘূর্ণিতে
(ওগো কঙ্কাবতী !)
বারেক তাকাই যদি তব মুখপানে,

পৃথিবী টলিয়া ওঠে, কথাগুলি কোথায় হারায়,
খুঁজে নাহি পাই।
দূর থেকে দেখে তাই ফিরে যাই ; (যদি কাছে আসি,
তব রূপ অটুট র'বে কি ?)
ফিরে চ'লে যাই।
দূর থেকে ভালোবাসি দেহখানি তব—
রাতের ধূসর মাঠে নিরিবিলি বটের পাতারা
টিপটাপ শিশিরের ঝরাটুকু
যেমন নীরবে ভালোবাসে।

মোরে প্রেম দিতে চাও ? প্রেমে মোর ভুলাইবে মন
তুমি নারী, কঙ্কাবতী, প্রেম কোথা পাবে ?
আমারে কোরো না দান, তোমার নিজের যাহা নয়।
ধার-করা বিত্তে মোর লোভ নাই ; সে-ঋণের বোঝা
বাড়িয়া চলিবে প্রতিদিন—
যতক্ষণ সেই ভার সর্বনাশ না করে তোমার।
সে-ঋণ করিতে শোধ দ্রৌপদীর সবগুলি শাড়ি
খুলিয়া ফেলিতে হবে।
সভামধ্যে, মোর দৃষ্টি-'পরে
নিতান্ত নিরাবরণা, দরিদ্র, সহজ
তোমাকে দাঁড়াতে হবে ; রহিবে না আর
রহস্যের অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রজাল।

বরং প্রেমের ভান করিয়ো না— সেই হবে ভালো :
দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হবো
তবু মুগ্ধ হবো।
না-ই বা চিনিলে মোরে। আমি যদি ভালোবেসে থাকি,
আমিই বেসেছি।

সে-কথা তোমার কানে নানা স্বরে জপিতে চাহি না ;—
আমার সে-ভালোবাসা— তুমি তারে পারিবে না কখনো বুঝিতে।

তবু ধরা যাক।
ধরা যাক, তুমি মোরে স্থাপিয়াছো হৃদয়ের মণির আসনে,
তুমি— আমি— দু-জনেরই সুদৃঢ় বিশ্বাস,
তুমি মোরে ভালোবাসো।
সেই অনুসারে মোরা চলি-ফিরি, কথা কই, হাতে হাত রাখি ;
লাল হ'য়ে ওঠো তুমি— অনেক লোকের মাঝে চোখে চোখ পড়ে যদি কভু,
লাল হ'য়ে উঠি আমি— পাশের লোকের মুখে তব নাম শুনি কভু যদি ;
আমার মুখের 'পরে চুলগুলি আকুলিয়া দাও—
সেই গন্ধে রোমাঞ্চিয়া ওঠে বসুন্ধরা।

আরো কহিবো কি ?
ননীর শরীর তব যেমন রেখেছে ঢেকে কুৎসিত কঙ্কাল,
তেমনি তোমার প্রেম কোন প্রেতে করিছে গোপন—
তাহা কহিবো কি ?
আমার দুর্ভাগ্য এই, সকলি জেনেছি।
মোর কাছে এসে আজ যে-অঞ্চল টানি' দাও সুন্দর লজ্জায়,
জানি, তাহা শ্লথ হবে কোনো-এক রাতে ;—
(তখন কোথায় আমি ?)
যে-শঙ্কার শিহরণ তব দেহ-লাবণ্যেরে মোর কাছে করেছে মধুর,
(ওগো কঙ্কাবতী—
মধুর ! মধুর !)
জানি, তাহা থেমে যাবে ধূসর প্রভাতে এক, যবে চক্ষু মেলি'
পার্শ্বস্থ জানুর দৃঢ় আকুঞ্চন থেকে
আপনার কটিতট নেবে মুক্ত করি'।

অনিশ্চিত ভয়ে ভরা ভবিষ্যৎ-তরে
যে-উৎকণ্ঠা নিত্য হানা দেয়
তোমারে-আমারে ;—
আমাদের মিলনের পরিপূর্ণতম মুহূর্তটি
যে-ব্যথায় টনটন ক'রে ওঠে ;—
তব কোলে মাথা রেখে চুলগুলি নিয়ে যবে আঙুলে জড়াই,
তখন যে-বেদনায় হেরি তোমা দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ,
যে-বেদনা এই প্রেমে করেছে মহান,
(ওগো কঙ্কাবতী—
মহান ! মহান !)
জানি, তুমি ভুলে যাবে সে-উৎকণ্ঠা, সে-বেদনা, সেই ভালোবাসা
প্রথম শিশুর জন্মদিনে।
তোমার যে-স্তনরেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সততস্পন্দিত—
দেখেছি অস্পষ্টতম আমি শুধু আভাস যাহার,
যাহার ঈষৎ স্পর্শ আনন্দে করেছে মোরে উন্মাদ— উন্মাদ,
জানি, তাহা স্ফীত হবে সদ্যোজাত অধরের শোষণ-তিয়াষে।
আমারে করিতে মুগ্ধ যে-সুস্নিগ্ধ সুষমায় আপনারে সাজাতে সর্বদা,
তোমার যে-সৌন্দর্যেরে ভালোবাসি (তোমারে তো নয় !),
জানি, তা ফেলিয়া দেবে অঙ্গ হ'তে টেনে—
কারণ, তখন তব জীবনের ছাঁচ
চিরতরে গড়া হ'য়ে গেছে,
কিছুতেই হবে নাকো তার আর কোনো ব্যতিক্রম।
সুন্দর না-হ'লে যদি জীবনের পাত্র হ'তে কোনো ক্ষতি, ক্ষয় নাহি হয়,
সুন্দর হবার গূঢ়, দুরূহ সাধনা—
ক্লেশকর তপশ্চর্যা
কে আর করিতে যায় তবে ?

সব আমি জানি, তবু— তাই ভালোবাসি,
জানি ব'লে আরো বেশি ভালোবাসি।

জানি, শুধু ততদিন তুমি র'বে তুমি,
যতদিন র'বে মোর প্রিয়া।
সম্মুখে মৃত্যুর গুহা, তোমার মৃত্যুর ;
ফুটেছো ফুলের মতো ক্ষণতরে আজিকার উজ্জ্বল আলোতে,
প্রেমের আলোতে মোর—
তারি মাঝে যত তব ঝিকিমিকি, ফুরফুরে প্রজাপতিপনা !
তাই সেই শোভা পান করি—
আঁখি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আত্মা দিয়ে, মৃত্যুর কল্পনা দিয়ে
সেই শোভা পান করি।
তোমার বাদামি চোখ— চকচকে, হালকা, চটুল
তাই ভালোবাসি।
তোমার লালচে চুল,— এলোমেলো, শুকনো, নরম
তাই ভালোবাসি।
সেই চুল, সেই চোখ, তাহারা আমার কাছে অরণ্য গভীর,
সেথা আমি পথ খুঁজে নাহি পাই,
নিজেরে হারায়ে ফেলি সেই চোখে, সেই চুলে— লালচে-বাদামি,
নিজেরে ভুলিয়া যাই, আমারে হারাই—
তাই ভালোবাসি।

আর আমি ভালোবাসি নতুন ননীর মতো তম্বুলতা তব,
(ওগো কঙ্কাবতী !)
আর আমি ভালোবাসি তোমার বাসনা মোরে ভালোবাসিবার,
(ওগো কঙ্কাবতী !)
ওগো কঙ্কাবতী !

শ্যাম মেঘপুঞ্জ যথা ঢেকে রাখে আকাশের লজ্জাহীন নীলিম নগ্নতা,
বিদ্রোহী তৃণের দল অনাবৃতা ধরিত্রীর রুক্ষ বক্ষে পরায় বসন,
প্রেমের পবিত্র ব্যথা আচ্ছাদন করি' রাখে কুমারীর কাম-চঞ্চলতা ;—
তেমনি ঢাকিয়া রাখো তোমার রূপের স্বপ্নে আমার সমস্ত প্রাণমন।
দৃশ্যমান জগতের চিহ্ন যথা লুপ্ত হয় অমাবস্যা-আঁধার-জোয়ারে,
হে অসূর্যম্পশ্যা, তব রূপের বন্যার স্রোতে মৃত্যু মোর ঘটুক তেমনি,
নিঃশেষে নিমগ্ন হ'য়ে নিজেরে হারাই যেন আনন্দে নীরন্ধ্র অন্ধকারে,
ঝরুক তোমার প্রেম, আকাশের ফাঁকে-ফাঁকে তারা যথা ঝরায় রজনী।

তনুর ললিত ছন্দে রচিয়াছো তিলে-তিলে অপরূপ যে-কবিতাখানি,
আমার ধ্যানের মন্ত্রে নিয়ত ধ্বনিত হোক মৌন তার সুরের ঝংকার ;
প্রাণের মৃন্ময় দীপে অগ্নির অক্ষর এঁকে লিখিয়াছো যে-অপূর্ব বাণী,
মর্মের অরণ্যে মোর মর্মরি' উঠুক তুলি' সংগীতের তরঙ্গ তাহার।
হৃদয়ের সব সুধা সঞ্চিত করিছো যেথা গোপনের আবরণ টানি',
মনের কামনা মোর একটি কুসুম হ'য়ে সেখানে করুক নমস্কার।

সুদূরিকা

চক্ষে যার বহ্নিরাগ, বক্ষে যার সুমধুর কুসুম-সুষমা,
অন্তরে লুকায়ে রেখো সংগোপনে সেই অন্তঃপুরচারিণীরে ;
সৃষ্টির আনন্দ-মোহে রচিয়াছো অন্ধকারে নব তিলোত্তমা—
সূর্যের দুর্জয় দাহে এনো না টানিয়া তারে নির্লজ্জ বাহিরে।

থাক সে নিশীথরাত্রে পত্রের মর্মর-মাঝে চিরবিরহিণী,
সুদূরিকা হ'য়ে থাক আকাশের নীহারিকা উদার, উদাস,
প্রভাতের তারা হ'য়ে জ্বলুক রূপের রেখা স্বপ্নের সঙ্গিনী,
সুরভির সুরা ঢালি' তুলুক মদির করি' উতল নিশ্বাস।

হারায়ে ফেলো না তারে বাহিরের হর্ম্যভরা হিরণ আলোতে,
মিলায়ে যাবে সে, হায়, ছায়াসম, বাসনার প্রখর কিরণে ;
ফেনিল মত্ততা যত সঞ্চরিছে বিষদগ্ধ নীল রক্তস্রোতে,
উদ্বেল উচ্ছ্বাসে তার ভাসায়ে দিয়ো না তব সুন্দর স্বপনে।
লেলিহান লালসারে নিবাইয়ো অশ্রু আনি' তার আঁখি হ'তে,
জ্যৈষ্ঠের নিষ্ঠুর তপ ভাঙিয়ো তাহার স্নিগ্ধ ব্যথার বর্ষণে।

আর-কিছু নাহি সাধ

আর-কিছু নাহি সাধ। জানি, মোর তরে নহে জয়মাল্য, যশের মুকুট ;
বিশ্বের কবিরা যত জ্বলিছে নক্ষত্র হ'য়ে রজনীর শ্যামল অঞ্চলে—
সেথা মোর নাহি স্থান। আমার বন্দনা-গান জাগিবে না নীল নভতলে ;
মোর করস্পর্শ কভু লভিবে না শ্রদ্ধাসিক্ত অভিষেক-পল্লবসম্পুট।
মানবের চিত্ততীর্থে নিত্যস্বর্গ নহে মোর : মরণের তিক্ত কালকূট
আমার চরম ভাগ্য। একবিংশ শতাব্দীর কোনো সপ্তদশী লীলাচ্ছলে—
মনে জানি— পড়িবে না আমার কবিতাখানি জ্যোৎস্না-স্নাত বাতায়ন-তলে ;
সতীর্থের হৃদ্‌পদ্মে গন্ধরূপে ক্ষণিকের স্মৃতিস্বপ্ন— জানি, তাও ঝুট।

তবু যে জাগিছে আজি সংগীত-তরঙ্গ-ভঙ্গ হৃদয়ের হিম সরোবরে—
সে শুধু তোমারি লাগি'। তোমারে যে পেয়েছিনু সর্বদেহে, মর্মে-মনে-প্রাণে,
পেয়েছিনু বিরহের স্পন্দমান অন্ধকারে, মিলনের নিস্পন্দ বাসরে—
সে-কথা কহিতে চাই আকাশেরে, ধরণীরে, তৃণেপত্রে, সমুদ্রের কানে ;—
পারি না বহিতে এই পরিপূর্ণতার ভার একা-একা আপন অন্তরে,
সহস্রের মাঝে তাই আপনারে বিতরণ ক'রে যাই লক্ষ গানে-গানে।

কোনো মেয়ের প্রতি

একটু সময় হবে ? পাশে গিয়ে বসিবো তোমার।—
(মোদের বাড়িতে বড়ো লোকজন, বিষম বিভ্রাট,
মায়ের মেজাজ চড়া, শিশুগুলি করিছে চীৎকার।)
টবেতে ফুলের চারা তোমাদের বাড়ির সিঁড়িতে,
নতুন সবুজ পাতা নড়িতেছে ঈষৎ হাওয়ায় :
সিঁড়ির স্থমুখে ঘর, ছোটো ঘর, ঠাণ্ডা, পরিষ্কার,
শেলাই-কলের কাছে ছোটো টুলে রয়েছো বসিয়া।
স্থতো বুঝি ফুরায়েছে ? বই খোলা কোলের উপরে,
ভিজে কালো চুলগুলি এলায়ে পড়েছে সারা পিঠে,
শাদা শেমিজেরে ঘিরি' কালো পাড় উঠেছে জড়ায়ে,
শাড়ির চওড়া পাড়, শাদা শাড়ি, মিশকালো পাড়।
ঠিক তব পাশে নয়—তবু কাছে, বসিবো চৌকাঠে—
একটু সময় হবে ?

মোদের বাড়িতে বড়ো লোকজন—কোথায় যে যাই।
বাইরে দারুণ রোদ—বেরোতেও সরে না যে মন।
দাঁড়ায়েছি জানালায়—নড়িতেছে নতুন পাতারা,
রাস্তায় এসেছি নেমে—সিঁড়িগুলো টবেতে সাজানো ;
রাস্তাটা হয়েছি পার—সবচেয়ে নিচের সিঁড়িটি !
মোরা কাছাকাছি থাকি, রাস্তাটির এপার-ওপার,
তুমি মোর নাম জানো, আমিও জেনেছি তব নাম।
তুমি মোর নাম শোনো, শুনেছি তোমার ডাক-নাম।
আমারে দেখিলে তুমি—পারিবে না ?—চিনিতে পারিবে,
আমি তো তোমারে চিনি ; মাঝখানে রাস্তাটুকু শুধু—
তারপর শাদা সিঁড়ি, লাল টবে নড়িছে পাতারা !

একটু বসিবো শুধু। থাক, তুমি না-ই বা উঠলে,
ছোটো টুলে ব'সে থাকো ; বেশ আছি—এখানে—চৌকাঠে।

ভিজে চুলগুলি দেখে সারা দেহ করিবো শীতল,
ছোটো পা দু-খানি দেখে ক্ষত মন লইবো সারায়ে।
লোকজন জড়ো হোক, প্রাণপণে চ্যাচাক শিশুরা,
মায়ের মেজাজ হোক আকাশের রোদের মতন ;—
আমার কী এসে যায় ? তুমি ব'সে আছো মোর কাছে ;
ভিজে তব চুলগুলি ; ঘরখানি ঠাণ্ডা, পরিষ্কার।

কহিবো হালকা কথা—বাজে কথা, তুমি যা বুঝিবে।
(নেহাৎ কহিতে হবে যদি !)
সেদিনের থিয়েটার—আমাদের পাড়ার খবর,
সবচেয়ে রূপসী কে আধুনিক সিনেমা-জগতে,
বব্‌ড্‌ চুল ভালো কিনা। আফ্রিকার জন্তু আর ব্যাধি।
মাঝে-মাঝে হাসিবে না ? ছলছল-ঢেউয়ের মতন।
ছলছল চলে ঢেউ— তার মতো বাজে তব হাসি।
জুড়াবে আমার দেহ ছলছল সেই হাসি শুনে,
জুড়াবে আমার মন ভিজে তব এলোচুল দেখে।—
সিঁড়ির সুমুখে ঘর— ছোটো ঘর— ঠাণ্ডা— পরিষ্কার—
মোদের বাড়িতে বড়ো লোকজন— বিষম বিভ্রাট—
একটু সময় হবে ?

একখানা হাত

আকাশে জমেছে মেঘ ; পথ নিরিবিলি ;
সব চুপ ; রাত দু-পহর।
বাড়িগুলি অন্ধকার পথের দু-ধারে ;
ঘুমায় শহর।

শরীরে জমেছে ক্লান্তি, তুই চোখে ঘুম,
হেঁটে-হেঁটে একা ফিরি বাড়ি।
এখনি আসিবে বৃষ্টি, তাই জোর ক'রে
চলি তাড়াতাড়ি।

হঠাৎ পথের মোড়ে একটি বাড়ির
নিচের ঘরের জানালায়
দেখিলাম, ম্লান-নীল ইলেকট্রিকের
আলো দেখা যায়।

শুধু এই জানালায় আলো জ্বলিতেছে,
অন্ধকার শহর নিরালা ;
কাছে এসে চোখ তুলে যেই তাকালাম,
—বুজিলো জানালা।

নিলাম তাহারি ফাঁকে পলকের তরে
একখানা শাদা হাত দেখে—
তুইটি কবাট এসে বুজিলো তখনি
তুই দিক থেকে।

একখানা শাদা হাত, কয়টি আঙুল,
আংটির হীরার ঝলক,
মণিবন্ধে সরু রুলি, ম্লান-নীল আলো,
—চোখের পলক।

আবার তু-চোখ ভ'রে ঘুম জ'মে এলো,
সকল পৃথিবী অন্ধকার :
—এই কথা না-জেনেই মৃত্যু হবে মোর
হাতখানা কার।

এসেছি নিজের ঘরে, বৃষ্টিও এসেছে,
হাওয়ার চীৎকার যায় শোনা ;
যার হাত, কাল তার মুখ দেখি যদি,
আমি চিনিবো না।

বিছানায় শুয়ে আছি, ঘুম হারায়েছে ;
না জানি এখন কত রাত ;
—কখনো সে-হাত যদি ছুঁই, জানিবো না,
এ-ই সেই হাত।

কঙ্কাবতী

তোমার নামের শব্দ আমার কানে আর প্রাণে গানের মতো—
মর্মের মাঝে মর্মরি' বাজে, 'কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !'
(কঙ্কাবতী গো।)
দূর সিন্ধুর তরঙ্গ-রোল অমাবস্যায় অনবরত
(অন্ধকারের অন্তর-ভরা ছন্দ-শিহর স্পন্দমান)
সুপ্তির 'পরে স্বপ্নের ঘোরে ফেটে বেজে ওঠে গানের মতো,
অন্ধকারের অন্তর থেকে তরঙ্গ-রোল ইতস্তত
কেঁপে ফুটে ওঠে, ফেটে বেজে যায় ; ঢেউয়ের মুখের ফেনার মতো
(কঙ্কাবতী গো)
গড়ায়, ছড়ায় সুপ্তির 'পরে স্বপ্নের ঘোরে সমস্ত রাত :
তেমনি তোমার নামের শব্দ, নামের শব্দ আমার কানে
বাজে দিন-রাত, বাজে সারা-রাত, বাজে সারা-দিন আমার প্রাণে
ঢেউয়ের মতন ইতস্তত ;
ঢেউয়ের মতন গান গেয়ে যায় : 'কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী।'
কঙ্কাবতী গো !

দিনের স্বপ্নে, রাতের স্বপ্নে তোমার নামের শব্দ শুনি,
(কঙ্কাবতী !)
লোকের চোখের অতীত স্বপ্নে তোমার নামের স্বপ্ন বুনি ;
(কঙ্কাবতী !)
গূঢ় গভীর মন্দির-মাঝে ঘণ্টার মতো সুগম্ভীর
পলকে-পলকে ধ্বনি বেজে ওঠে— 'কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !'
আমার মনের গুহার বুকে :
আমার মনের অনেক গুহার চূড়ায়-চূড়ায় শব্দ বাজে,
চূড়ায়-চূড়ায় ঠেকে ভেঙে যায়, ছড়ায় হাওয়ায় ইতস্তত—
দশ দিক থেকে কথা ক'য়ে ওঠে প্রতিধ্বনি :
গভীর গুহার গহ্বর থেকে গাঢ়কণ্ঠ প্রতিধ্বনি :
আমার মনের অপার আকাশে হাজার-হাজার প্রতিধ্বনি :
ডাহিনে ও বামে, উপরে ও নিচে, এখানে-ওখানে প্রতিধ্বনি :
প্রতিধ্বনি !
'কঙ্কা— কঙ্কা— কঙ্কাবতী গো— কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী—'
এখানে-ওখানে প্রতিধ্বনি ।

দিনের কাজের হাজার আওয়াজ হাজার হাওয়ার জোয়ারে বহে,
হাওয়ার রথের চাকায়-চাকায় ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে আকাশে রটে
কী কলরোল ।
আমি সে-দিনের শব্দের নিচে, আমি সে-কাজের শব্দের পিছে শুনি,
আমার বুকের হৃদয়ের রোলে, রক্তের তোড়ে, কানে আর প্রাণে শুনি—
(কঙ্কাবতী)
হৃৎ-শব্দের তালে তাল রেখে টিপ টিপ টিপ গান গেয়ে যায়
'কঙ্কা— কঙ্কা— কঙ্কাবতী—
কঙ্কাবতী গো ।'
রাতের ঘুমের নীরব সময় মুখর তোমার নামের গানে,
প্রতি মুহূর্ত ফুটে ঝ'রে যায়, ফেটে ম'রে যায় ফুলের মতো,
ফুটে ঝ'রে যায় তোমার নামে ;

রাতের ঘুমের প্রতি মুহূর্ত সুখে ফুটে ওঠে তোমার নামে,
প্রতি মুহূর্ত তোমার নামের শব্দে ফোটে ;
কাজের জোয়ারে, ঘুমের সময়ে তোমার নামের শব্দ রটে—
'কঙ্কা— কঙ্কা— কঙ্কাবতী !
কঙ্কাবতী গো !'

মাঝ-রাতে দেখি আকাশের বুকে ঝকঝকে তারা— আলোর পোকা,
আকাশ কোমল।
আকাশ কোমল, আকাশ কালো।
কোমল-কালো সে-আকাশের বুকে ঝকঝকে তারা একশো কোটি
আলোর পাখার আড়ালে তাকায়, আবার লুকায়, তাকায় হঠাৎ,
চোখের পাতার খুব কাছে এসে মিটমিট ক'রে তাকায় হঠাৎ,
আবার লুকায় আলোর পাখার আড়াল টেনে।
আমি মনে ভাবি : তোমার নামের শব্দের সুর ওরাও জানে,
সেই সুরে ওরা ঘুরে-ঘুরে নাচে, দূরে আর কাছে বেড়ায় উড়ে—
ঝিকমিক !
সেই সুরে ওরা কখনো তাকায়, কখনো লুকায়, তাকায় আবার
মিটমিট !
আকাশের বুকে ফুটেছে তোমার নামের শব্দ একশো কোটি,
তোমার নামের শব্দ আমার মনের আকাশে তারার মতো,
ফুটেছে তোমার নামের শব্দ তারার মতন একশো কোটি—
কঙ্কাবতী গো ! কঙ্কাবতী গো ! কঙ্কাবতী !
তারার মতন একশো কোটি।

আবার কখনো জেগে রয় রাতে একা বাঁকা চাঁদ পশ্চিমেতে,
রাতের নদীতে আরো জেগে রয় আঁকাবাঁকা চাঁদ জলের নিচে ;
পশ্চিম-ভরা আকাশ ফাঁকা।
তারাদের কেউ দেয় নাই দেখা, আকাশ ফাঁকা,
একা জাগে চাঁদ— তা ছাড়া সকল আকাশ ফাঁকা।

শুধু ঐ দূরে দিগন্ত-রেখা যেখানে ঢলেছে গাছের নিচে,
একসার মেঘ, সরু, এলোমেলো, আঁকাবাঁকা কালো সাপের মতো
গাছের সবুজে জড়ায়ে শরীর রয়েছে প'ড়ে।
আঁকাবাঁকা মেঘ, একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ জলের নিচে,
আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা।
আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভ'রে : মনে হয় মোর আঁকাবাঁকা
জলে, মেঘের রেখায়
একা বাঁকা চাঁদ চুপ-চুপ ক'রে কথা ক'য়ে যায় :
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঝ'রে পড়ে স্বর— 'কঙ্কা ! কঙ্কা !
কঙ্কাবতী !'
সাপের মতন জড়ানো মেঘের বুকে জেগে ওঠে সাপের মতন দ্রুত বিদ্যুৎ,
লাল বিদ্যুৎ, দ্রুত বিদ্যুৎ তোমার নামের শব্দে জাগে ;
আকাশ ফাটায়ে লাল বিদ্যুৎ বজ্র বাজায়— 'কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !'
আকাশের কোন ফাঁকা কোণ থেকে দেখা দেয় এক তাড়ানো তারা
হঠাৎ ! হঠাৎ !
খসা তারা এক, মরা তারা এক আগুনের মুখ নিয়ে ছুটে যায়,
অবাক ! অবাক !
চোখের পলকে ছুটে চ'লে যায়, ফুলকি ছড়ায়ে জ্ব'লে পুড়ে যায়,
মুখ থুবড়িয়ে উলটিয়ে পড়ে মাটির 'পরে,
উবু হ'য়ে পড়ে ঠাণ্ডা, শক্ত মাটির 'পরে।—
তবু তার পিছে জ্ব'লে চ'লে আসে লাল আলোকের দীর্ঘ রেখা,
সাপের মতন আঁকাবাঁকা রেখা, দীর্ঘ রেখা,
জ্ব'লে চ'লে আসে, কেঁপে-কেঁপে জ্বলে, জ্বলে আর বলে— 'কঙ্কা ! কঙ্কা !
কঙ্কাবতী !'
এলোমেলো জলে আলো ওঠে জ্ব'লে, ছলছল ঢেউ তোমার নামে
তীরে চুমো খায়, দূরে নিয়ে যায় ঢেউয়ের জলের স্রোতের টানে
তোমার নামের শব্দ, 'কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !'
আকাশে ও চাঁদে, জলে আর মেঘে, দিগন্ত-পারে গাছের ছায়ায়,
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, মেঘের শরীরে, জলের স্রোতে—
চুপে-চুপে বলা চাঁদের মুখের কথা

চাঁদের মুখের কথা জেগে ওঠে : কঙ্কাবতী !
আমার মনের কথা বেজে ওঠে : কঙ্কাবতী !
তোমার নামের শব্দ স্বনিছে, কঙ্কাবতী !
কঙ্কাবতী গো !

গান

চোখে চোখ পড়েই যদি, নিয়ো না চোখ ফিরিয়ে,
নিয়ো না চোখ নামিয়ে— রাখো এই— একটুখানি ।
সীমাহীন এক নিমেষে— খোলা ঐ জানলা দিয়ে
কী আছে তোমার মনে— যা আছে, সব দেখে নিই ।
বোলো না, 'একটু সময়— ছুটি চোখ— এমন কী আর !'
গালে লাল রং এনো না, তোমাকে মানায় না তা,
ও দেখুক ভোরের আকাশ, এ দেখুক রাতের আঁধার—
আমার এ একটু সময়— কালো চোখ, কোমল পাতা ।
কালো চোখ আলোক-ভরা, ছায়াময় কোমল পাতা,
আলো আর ছায়ার ছবি— ঝিকিমিক আমার চোখে,
নিয়ো না চোখ ফিরিয়ে— যা বলে বলুক লোকে—
চোখে চোখ পড়বে যখন ।

মুখে মুখ রাখিই যদি, এমন আর দোষ কী, বলো ?
মনেরে যায় না ছোঁয়া, কেমনে চাখবো তারে ।
ছুটি ঠোঁট— ফুরফুরে ঠোঁট, টুকটুক-রঙিন হ'লো,
ঠোকরাই পাখির মতো, খুটখুট চার কিনারে ।
চারিদিক ঠুকরিয়ে খাই, ছুটি ঠোঁট ফলের মতো,
ঐ মুখ ফুলের মতো ফুটেছে আমার পানে ;
খুলে দাও চুলের বোঝা ঝপাঝপ ইতস্তত,
ফুটফুট নরম বুকে টেনে নাও বাহুর টানে ।

টেনে নাও আমায় তুমি ফুটফুট নরম বুকে,
হৃদয়ের গোপন কথা টিপটিপ নরম বুকে,
শোনো ঐ কইছে কথা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় !
গড়িয়ে পায়ের নিচে ব'য়ে যায় অসীম সময়—
মুখে মুখ রাখলে পরে।

আমন্ত্রণ— রমাকে

তুমি এখানে কখনো যদি আসবে, মেয়ে
শোনো, আসবে কখন ;
যবে আঁধার নামবে শাদা আকাশ ছেয়ে,
কালো আঁধার নামবে লাল আকাশ ছেয়ে,
যবে সন্ধ্যাতারার মুখ থাকবে চেয়ে
মোর মুখের পানে
নির্- নিমেষ নয়ন—
যবে জাগবে রাতের হাওয়া উতল গানে—
তুমি আসবে তখন।

মানে— আসবে এখানে তুমি সন্ধ্যা হ'লে—
তুমি লক্ষ্মী মেয়ে !
মেশা উষ্ণ তুষার তব লাল কপোলে,
মাখা সুর্মা তোমার কালো চোখের কোলে,
শাদা গলায় তোমার শাদা মুক্তা দোলে ;
ঘন নীলাম্বরী
শাদা শরীর ছেয়ে।
এনো স্বপ্ন তোমার কালো নয়ন ভরি',
এসো, লক্ষ্মী মেয়ে।

আমি ধরবো দু-হাত তব নিমেষ-তরে
তুমি আসবে যখন ;

তব	নাম ধ'রে ডেকে তোমা আনবো ঘরে,
যাবে	চুলের স্থবাসে তব বাতাস ম'রে ;
শাদা	আলোক প'ড়ে নীল শাড়ির 'পরে
কেঁপে	উঠবে স্থখে—
তুমি	আসবে যখন।
হেসে	তাকাবো গোলাপ-ফোটা তোমার মুখে
শাদা	তুষার-বরন।

আমি	বসাবো তোমাকে মোর ইজি-চেয়ারে,
আমি	বসবো পাশে।
ঘরে	জ্বলবে মোমের আলো এক কিনারে,
আর	জ্বলবে সন্ধ্যাতারা আকাশ-পারে,
আর	জ্বলবে স্বপ্ন তব আঁখির ঠারে ;—
কালো	আঁখির কোলে
শাদা	আলোক ভাসে ;
মোর	হৃদয়ের তোলপাড় শান্ত হ'লে
আমি	বসবো পাশে।

ঢের	গল্প-গুজব হবে তোমায়-আমায়
শুধু	আমরা দু-জন ;
নয়া	চুলের ফ্যাশন থেকে সাহিত্য যায় ;
হাসি	ফুটবে ফুলের মতো চোখের কোনায়,
হাসি	কাঁপবে আলোর মতো অধর-সীমায়—
লাল	ঠোঁটের 'পরে—
কালো	নয়ন-মগন !
শত	গহন স্বপনে ঘন নয়ন ভ'রে
হাসি	ফুলের মতন।

আমি	বলবো তোমাকে ঢের মিথ্যে কথা—
তুমি	শুনবে, মেয়ে ;

তব   শরীর— অন্ধকারে বিজলি-লতা,
নীল   শাড়িতে মেঘের ঘন তমিস্রতা ;
দুই   বাহুতে জলের মতো উচ্ছলতা,
শত   কবির স্বপন
তব   নয়ন ছেয়ে।
তব   নয়নে মরণ, তব চরণে মরণ !—
তুমি   শুনবে মেয়ে।

তুমি   বলবে আমাকে ঢের মিথ্যে কথা,
আমি   শুনবো, মেয়ে।
তব   স্বর্গের অর্ঘ্যের আমি দেবতা,
তব   হৃদয়-গগনে আমি তপন-যথা,
তব   হৃদয়-সাগরে চির-চঞ্চলতা—
চোখে   ফুটলো আলো
মোর   নয়নে চেয়ে ;—
ম্লান   মোমের আলোয় মোরে বাসবে ভালো—
তুমি   লক্ষ্মী মেয়ে।

তুমি   মোমের আলোয় ভালোবাসবে মোরে—
মোরা   পড়বো প্রেমে,
ভালো-   বাসবো তোমায় আমি হৃদয় ভ'রে
এক   তারকা-ফোটা ঘন সন্ধ্যা ধ'রে,
মোরা   বাসবো, বাসবো ভালো পরস্পরে ;
দূর   আকাশ থেকে
প্রেম   আসবে নেমে।
প্রেমে   নাম ধ'রে ঘরে মোরা আনবো ডেকে,
মোরা   পড়বো প্রেমে।

মধ্যরাত্রে

'Pray but one prayer for me 'twixt thy closed lips,
Think but one thought of me up in the stars.'

WILLIAM MORRIS

ভাবিয়ো আমার কথা একবার তারা-ভরা আকাশের তলে,
কহিয়ো আমার নাম একবার নিশীথের বাতাসের কানে ;
নয়ন তুলিয়া তব চাহিয়ো একটিবার আকাশের পানে,
একবার মুখ তুলে ডাকিয়ো আমার নাম বাতাসের কানে।
আকাশে তারার ভিড়, আকাশে রুপার রেখা বাঁকা চাঁদ জ্বলে ;
রজনী গভীর হয় ; বাতাসে মদির গন্ধ ; চাঁদ পড়ে ঢ'লে—
চাঁদের রুপালি রেখা লাল হ'য়ে ঢ'লে পড়ে পশ্চিমের কোলে।
রজনী গভীর হয় ; আকাশ আঁধার হ'য়ে আসে পলে-পলে—
ক্লান্ত চাঁদ ঢ'লে পড়ে, ক্লান্ত আঁখি ঢুলে আসে আকাশের তলে।
ভাবিয়ো আমার কথা একবার তারা-ভরা আকাশের তলে,
কহিয়ো আমার নাম একবার নিশীথের বাতাসের কানে।
বাতায়নে তারা জাগে, চাঁদের রুপালি আলো শয়ন-শিথানে,
শিশিরের মতো ঘুম ঝ'রে পড়ে নিশীথের আকাশের তলে,
নয়ন জড়ায়ে আসে, নয়ন ভরিয়া যায় স্বপ্নের ফসলে ;
রাতের ঘুমের আগে কহিয়ো আমার নাম বাতাসের কানে,
কহিয়ো আমার নাম ভালোবেসে একবার বালিশের কানে,
রাতের ঘুমের আগে ভাবিয়ো আমার কথা আকাশের তলে,
ভাবিয়ো আমার কথা ভালোবেসে একবার জানালার তলে ;
নয়ন মেলিয়া তব চাহিয়ো একটিবার জানালার পানে,
একবার মুখ খুলে ডাকিয়ো আমার নাম বালিশের কানে ;
তারপর চোখ বুজে দেখিয়ো আমার মুখ আঁধারের তলে,
দেখিয়ো আমার মুখ একবার ঘুমে-ভরা আঁধারের তলে—
রাতের ঘুমের আগে দেখিয়ো আমার মুখ নয়নের তলে,
দেখিয়ো আমার মুখ একবার নয়নের পল্লবের তলে।

—কহিয়ো আমার নাম একবার নিশীথের বাতাসের কানে,
ভাবিয়ো আমার কথা একবার তারা-ভরা আকাশের তলে,
—তারা-ভরা আকাশের, তারা-ঝরা জানালার তলে,
নিশীথের বাতাসের, ঘুমে ভরা বালিশের কানে।

বিরহ

ভ্রমর, ওরে ভ্রমর, কত করবি গুনগুন !
ঘরের মধ্যে জ্বালিয়ে দিলি সংগীতের আগুন।
গান যেন তোর ব্যর্থ না হয়, ঈশ্বর করুন।

ভ্রমর, ওরে ভ্রমর, তুই একটু চুপ কর,
বুকের মধ্যে শুনছি আমার আর-একজনের স্বর,
তোরি মতন দুপুর ভ'রে করতো যে গুনগুন।

ভ্রমর, কালো ভ্রমর, ওরে ভ্রমর উতলা,
তোকে শুনে ব্যথা যে আর সইতে পারি না—
ব্যথা আমার ব্যর্থ না হয়, ঈশ্বর করুন।

আর-বছরে জ্বলেছি তার গানের আগুনে,
কোথায় গেলো গানের রানী এবার ফাগুনে,
গান যেন তার ব্যর্থ না হয়, ঈশ্বর করুন।

ভ্রমর, ওরে ভ্রমর, আমি আজকে একেলা,
বুক ঠেলে যে কান্না ওঠে, সইতে পারি না।
আমার কাছে আর কত রে করবি গুনগুন !

ভ্রমর, কালো ভ্রমর, ফিরে আসিস আর-বছর,
চুপ ক'রে তুই শুনবি তখন আর-একজনের স্বর।
প্রার্থনা মোর ব্যর্থ না হয়, ঈশ্বর করুন।

এই শীতে

আমি যদি ম'রে যেতে পারতুম
এই শীতে,
গাছ যেমন ম'রে যায়,
সাপ যেমন ম'রে থাকে
সমস্ত দীর্ঘ শীত ভ'রে।

শীতের শেষে গাছ নতুন হ'য়ে ওঠে,
শিকড় থেকে উর্ধ্বে বেয়ে ওঠে তরুণ প্রাণরস,
ফুটে ওঠে চিক্কণ সবুজ পাতায়-পাতায়
আর অজস্র উদ্ধত ফুলে।

আর সাপ ঝরিয়ে দেয় তার খোলশ,
তার নতুন চামড়া শঙ্খের মতো কাজ-করা ;
তার জিহ্বা ছুটে বেরিয়ে আসে আগুনের শিখার মতো,
যে-আগুন ভয় জানে না।

কেননা তারা ম'রে থাকে
সমস্ত দীর্ঘ শীত ভ'রে,
কেননা তারা মরতে জানে।

যদি আমিও ম'রে থাকতে পারতুম—
যদি পারতুম একেবারে শূন্য হ'য়ে যেতে,
ডুবে যেতে স্মৃতিহীন, স্বপ্নহীন অতল ঘুমের মধ্যে—
তবে আমাকে প্রতি মুহূর্তে ম'রে যেতে হ'তো না
এই বাঁচবার চেষ্টায়,
খুশি হবার, খুশি করবার,
ভালো লেখবার, ভালোবাসার চেষ্টায়।

স্পর্শের প্রজ্বলন

এমন দিনে তারে বলা যায়,
আজকের মতো এই বর্ষার দিনে।

কিন্তু বলবার কিছু নেই যে।
এখন আর
কিছু বলবার কথা নেই ;
এখন শুধু স্পর্শের স্বাক্ষর,
স্পর্শের প্রজ্বলন।

স্পর্শ, স্পর্শ !
আগুনের শাঁস,
ঈশ্বরের শরীর।
এখন আর কিছু বলবার নেই।
এখন শুধু স্পর্শের লাল ফুলের উন্মীলন।

কেন আমি একা ?
কেন আমার বুকের মধ্যে এই বর্ষার হাওয়ার হাহাকার ?
কেন তুমি একা,
তোমার মুখ অমন ম্লান কেন, কেন তোমার চোখের নিচে ক্লান্তির কালো ফুল ?

কেন আমাদের মাঝখানে এই মানুষের দেয়াল ?

দেবতা দুই

(অংশ)

(২)

দেবতা শুধু নিষ্ঠুর নন,
দেবতা শুধু বজ্রের নন,
দেবতা শুধু মৃত্যুর নন :

দেবতা উৎসবের
দেবতা বসন্তের
দেবতা চুম্বনের।

বজ্রের যিনি দেবতা
তিনি আমাদের বুকের মধ্যে বাজেন ভীমগম্ভীর স্বরে,
তাঁর প্রতিধ্বনিতে ফেটে যায় শরীরের দেয়াল,
আমরা ম'রে যাই।

তারপর চুম্বনের দেবতা আমাদের বাঁচিয়ে তোলেন,
নতুন হ'য়ে আমরা জেগে উঠি,
আমাদের শরীরে তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর মহিমা।

বজ্রের যিনি দেবতা তাঁকে প্রণাম করি,
তিনি ভয়ংকর ;
চুম্বনের যিনি দেবতা তাঁকে ভালোবাসি,
তিনি অপরূপ।

দেবতা শুধু মৃত্যুর নন, দেবতা উৎসবের,
দেবতা শুধু বজ্রের নন, দেবতা চুম্বনের।

জন্ম

তোমাকে বুকে ক'রে, তোমাকে বুকে ভ'রে কাটে আমার রাত্রি।
সমস্ত চিরকাল সেই উত্তাল অন্ধকার-মন্থিত মুহূর্তে
থমকে দাঁড়ায়— যেন পথ হারায় অন্ধ অবায়ু চিরায়ু মহাশূন্যের যাত্রী—
কোন উদ্যত খড়্গের মতো আমার উত্তপ্ত মাংসের মধ্যে খুঁড়তে।

তোমাকে বুকে রেখে, তোমার মুখের মধ্যে ঢেকে আমার মুখের আহত,
বিক্ষত ক্লান্তি
প্রতি নিশ্বাসে আমি নিঃশেষে শোষণ করি তোমার রাত্রির শক্তির উৎস :
হে চোখ-ধাঁধানো চূড়া! আমার দৃষ্টি যে ফুরায়— এ কী জ্বলন্ত অশান্তি,
এ কী শান্তি!
হে অদৃশ্য, কবোষ্ণ বন্যা, স্পর্শময় প্রাণ-ঝরনা, কোন সংগোপন সুড়ঙ্গ থেকে
তুমি উঠছো!

আগ্নেয়, দুঃসহ, তীব্র, উত্তাল, বিশাল এই রাত্রি।
কাঁপে পাহাড়, ভাঙে কঙ্কাল-হাড়, জাগে সুড়ঙ্গে জোয়ার, অদম্য।
হে দৃষ্টি-অন্ধ-করা যুগ্ম চূড়া, এ কোন যজ্ঞ? বলো, তুমিই কি ধাত্রী
দিগন্তে ঘুমন্ত সূর্যের? হে অন্ধকার, তুমি কি মৃত্যুর, তুমি কি জন্মের সিংহদ্বার?
এ কী অসহ্য মৃত্যু! এ কী উজ্জ্বল, অলজ্জ নব জন্ম!

এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে

এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে, এই পৃথিবীর।
একদিকে আমি, অন্যদিকে তোমার চোখ স্তব্ধ, নিবিড়;
মাঝখানে আঁকাবাঁকা ঘোর-লাগা রাস্তা এই পৃথিবীর।

আর এই পৃথিবীর মানুষ তাদের হাত বাড়িয়ে
লাল রেখা আঁকতে চায়, তোমার থেকে আমাকে ছাড়িয়ে
জীবন্ত, বিষাক্ত সাপের মতো তাদের হাত বাড়িয়ে।

আমার চোখের সামনে স্বর্গের স্বপ্নের মতো দোলে
তোমার দুই বুক ; কল্পনার গ্রন্থির মতো খোলে
তোমার চুল আমার বুকের উপর ; ঝড়ের পাখির মতো দোলে

আমার হৃৎপিণ্ড ; আমরা ভয় করবো কাকে ?
আমরা তো জানি কী আছে এই রাস্তার এর পরের বাঁকে—
সে তো তুমি— তুমি আর আমি : আর কাকে

আমরা দেখতে পাবো ? আমার চোখে তোমার দুই বুক
স্বর্গের স্বপ্নের মতো ; তোমার বুকের উপর উত্তপ্ত, উৎসুক
আমার হাতের স্পর্শ ; কূল ছাপিয়ে ওঠে তোমার দুই বুক

আমার হাতের স্পর্শে, যেন কোনো অন্ধ অদৃশ্য নদীর
খরস্রোত ; তার মধ্যে এই সমস্ত দুরন্ত পৃথিবীর
চিহ্ন মুছে যায় ; শুধু এই বিশাল অন্ধকার নদীর

তীব্র আবর্ত, যেখানে আমরা জয়ী, আমরা এক, আমি
আর তুমি— কী মধুর, কী অপরূপ-মধুর এই কথা—
তুমি— তুমি আর আমি।

দয়াময়ী মহিলা

আমার দুঃখ দেখে দয়া হয় কি তোমার
দয়াময়ী মহিলা ?
তাই কি আমার কাছে আসতে চাও—
দয়াময়ী মহিলা !

থাক, দাঁড়াও ওখানেই, মুখ ফেরাও,
করুণাময়ী !

মরতে দাও আমাকে একা, কিন্তু তোমার
ঐ দয়ার দেবীত্বের লীলা

তা থেকে আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও।
ফিরে যাও, হে দেবী, ফিরে যাও
যেখানে তোমার স্বরক্তের শাখা-প্রশাখা,
তোমার উৎস, তোমার মূল,

যেখান থেকে দয়া ক'রে এসেছিলে
আমাকে একা দেখে, ভালোবেসে,
আমাকে ভালোবেসে— কী ভুল!

কে চায় তোমার ভালোবাসা, কে চায়!
তোমার ঐ শাদা দয়ার ভালোবাসা কে চায়, বলো!
নিয়ে যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও, হে দেবী-অতিথি—
কেঁদো না, ঐ তোমার চোখের ছলোছলো

করুণ দৃষ্টি অনেক মেরেছে আমাকে।
কাঁদতে-কাঁদতে তুমি এসেছিলে— কেন এলে?
অত কান্নার দাম আমার মধ্যে নেই,
সত্য ক'রে বলি।

এখন আর কেঁদো না, যাও; ফিরে-ফিরে
আর তাকিয়ো না; আমিও
অনেক কেঁদেছি, অনেক; বুক ভেঙে গেছে;
তোমার করুণার অমিয়

সে-ফাটা জোড়া লাগাবে না; যাও তুমি,
যেখানে তোমার শান্তির ছায়া,
তোমার জন্ম-তরুর মূল আর শাখা।
—আমার রাস্তায় অনেক কাঁটা, অনেক আঁকাবাঁকা।

আমার মধ্যে শান্তি পাবে না এ তো জানতেই।
আমি ক্ষুধিত, আমি অস্থির, আমি নিষ্ঠুর,
চীৎকার ক'রে আমি চাই, চাই, চাই,
হয়তো কোনদিন ভেঙে ফেলতুম তোমার মধুর

দেবী-প্রতিমা, লোকে ছী-ছি বলতো। যাক, ভালোই হ'লো,
এ-খেলা যে ভাঙলো, ভালোই হ'লো।
এবার তো দেখলে আমার চরম নগ্নতা—
কী হিংস্র আমি, নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর!

নির্লজ্জের মতো চেয়েছিলুম তোমাকে
সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র তুমি।
আর-কেউ নয়, আর-কিছু নয়, শুধু তুমি—
তুমি!

আর তুমি কি চাও আমাকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে,
কোনোখানে একটু খোঁচ থাকবে না, একটু চিড়।
নিজেকে হাজার টুকরো ক'রে দেবো বিলিয়ে

যত-কিছু তুমি ভালোবাসো, সবার মধ্যে,
নানা আয়োজনে, নানা অনুষ্ঠানে,
রীতিপালনে, নিয়মরক্ষায়। সবই সুন্দর,
ছন্দের সুষমায় গাঁথা! —নিতে আমাকে কুড়িয়ে,

ভাঙা টুকরোগুলো ভালোবাসার সুতো দিয়ে গেঁথে!
ক্ষমা করো আমাকে— অন্য সব ভালোবাসা আমার গেছে ফুরিয়ে

তোমাকে ভালোবেসে। নির্বোধের মতো চেয়েছিলুম তোমাকে
সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে— তুমি আমার, আমার!
ভ্যাখো, এই তো আমার ভালোবাসা, যা আমি দিতে পারি,

এতে উন্মত্ততা, এতে সর্বনাশ। এ কি তোমার সইবে ?
আমার চুম্বনের ধারে তুমি কি ছিঁড়ে যাবে না ?
ভয় নেই— আমিও ছিঁড়ে গেছি আমার বাসনার ধারে।

ভয় নেই তোমার, তুমি যাও,
যাও, ছলোছলো চোখে ফিরে-ফিরে চেয়ো না,
একা মরতে দাও আমাকে।

জানি তোমার ছলোছলো চোখ, জানি কান্না ;
আমারও বুক কান্নায় ভেঙে গেছে।
এখন আমার ভাঙাচোরা টুকরোগুলো কুড়িয়ে

তুমি কি দয়া দিয়ে বাঁচাতে চাও ? যাও, এগিয়ে যাও,
হাওয়ায় তোমার কালো চুল দাও উড়িয়ে,
ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাক তোমার বুকের ঠাণ্ডা দয়া।

হও নিষ্ঠুর ; তোমার ভালোবাসা যাক ফুরিয়ে,
ভয় কোরো না। তবু হোক তোমার বুক আগুনের উৎস,
আমাকে পোড়াও আগুনের ঝরনায়, যদি পারো,
তোমার ঘৃণার চাবুকে মারো আমাকে, মারো,

হও স্ত্রী, হও স্ত্রীলোক— দয়ার শ্বেত দেবী নয়,
নয় নিয়মের ছন্দে ঢালা মহিলা !
অনেক দেখেছি তোমার দয়া-শ্বেত ভালোবাসার লীলা—
আর নয় !

চিল্কায় সকাল

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন ক'রে বলি।

কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে :

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে ;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।

তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
ইস্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।
গাড়ি চ'লে গেলো। —কী ভালো তোমাকে বাসি,
কেমন ক'রে বলি।

আকাশে সূর্যের বন্যা, তাকানো যায় না।
গোরুগুলো একমনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত !
—তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে এসে আমরা পাবো
যা এতদিন পাইনি।

রুপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্যের চুম্বনে। —এখানে জ্ব'লে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে ?

কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে-যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে
জলের উপর দিয়ে। —কী দুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে, আর আমার
কী ভালো লেগেছিলো

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ মুখ। ছাখো, ছাখো,
কেমন নীল এই আকাশ। —আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন ক'রে বলি।

পাণ্ডুলিপি

অজীর্ণ রোগে শীর্ণ, মগজে
পক্ষপাতী পাটিগণিত ঠাশা ;
মাথার অল্প চুল তেলে চিকচিকে,
চোখ দুটো ধূর্ত, লোভে হলদে।
সে তার তেল-চিটচিটে, স্যাঁৎসেঁতে আঙুল দিয়ে
নেড়ে-চেড়ে দেখছে আমার পাণ্ডুলিপির
হংস-শুভ্র পাতাগুলো,
যা এর আগে আমি ছাড়া কেউ ছোঁয়নি ;
আর তার ধূর্ত চোখের ছোটো-ছোটো গর্ত
আমার দিকে মিটমিট ক'রে বলছে—
'এ-বই আপনার চলবে তো?'

মনে পড়লো সারা রাত জেগে এই বই যখন শেষ করেছিলুম।
নিজেকে মনে হয়েছিলো দেবতা, কী অপরূপ!
যেন এই শাদা পাতাগুলো দিয়ে ছোটো একটি সূর্য আমি তৈরি করেছি,
একটি সূর্য, আমারই প্রাণে জলন্ত।

আর সেই কাক-ভোরে
বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ
ঘুমোতে পারিনি আনন্দে।
যে গাইতে পারে তার গলা বেয়ে যেমন ওঠে গান,
তেমনি আনন্দ উঠছিলো আমার বুক ঠেলে।
ক্লান্ত শরীর, চোখে ঘুমের তৃষ্ণা, তবু আনন্দে
ঘুমোতে পারিনি।

আর তারপর এই ধূর্ত চোখের ছোটো-ছোটো মিটমিটে গর্ত
আর লোভে-চিটচিটে দুটো থাবা
আমার স্বর্য-শুভ্র পাণ্ডুলিপিটা চটকাচ্ছে।

ভেবেছিলুম একটা মির‍্যাকল ঘটবে, ঘটলো না।
ফেটে পড়লো না আমার ছোটো স্বর্য, দারুণ বিস্ফোরণে।
সে তার নোংরা স্যাঁৎসেঁতে আঙুলগুলো রাখলো আমার লেখার গায়ে-
তবু বেঁচে রইলো।

অবাক হ'য়ে গেলুম।

বৃষ্টি আর ঝড়

বৃষ্টি আর ঝড়, বৃষ্টি আর ঝড়, রাত্রি আর দিন।
দিন ধূসর, বন্ধ্য, অন্ধকার। আলো নেই
ছায়াও নেই। শুধু বৃষ্টির কুয়াশা, শুধু মেঘের আবছায়া, আর
ট্র্যামের গোঙানি, ট্র্যাফিকের ঘর্ঘর।

আকাশে চাপা কান্না, হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস।
দীর্ঘ দীর্ঘ দিন, রাত্রি কত দূর ?
ক্লান্ত প্রহর, মুহূর্ত মন্থর ; কালের শৃঙ্খল-ঝঞ্চনা
অন্তহীন, ক্লান্তিহীন।

রাত্রি ; ঘরে শূন্যতা, বাইরে অন্ধকার,
বৃষ্টি আর ঝড়, বৃষ্টি আর ঝড়।
শূন্য শূন্য হৃদয়, ব্যর্থ ব্যর্থ রাত্রি,
শুধু ক্রুদ্ধ শহরের ঘুমহীন গুমরানি।

হৃদয়ে শূন্যতা, শহরে আর্তস্বর, আকাশে অন্ধকার।
ছায়া, হাওয়া, স্বর, মর্মর, ক্রুদ্ধ রুদ্ধস্বর, দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস
শহরে, শূন্য ঘরে, বৃষ্টি-ঝরা অন্ধকারে, কালের শৃঙ্খল-ঝংকারে
সারা রাত্রি, সারা দিন।

দিন শূন্য, পচা ডোবার মতো চুপচাপ। রাত্রিও বোবা,
কিছু নেই। নেই নেই।
বৃষ্টির ধূসর কাপড়ে, বাতাসের শহরের আর্ত স্বরে
সৃষ্টির মুখ ঢাকা। কিছু নেই। আমি একা একা।

কালের বিশাল চাকায় অন্ধ মাছির মতো বন্দী ;
বিশ্বের জানলা বন্ধ ; অন্ধকার, রুদ্ধশ্বাস,
পচা ডোবার মতো দিন ; পুরোনো বিস্মৃত কুয়োর তলার মতো
রাত্রি ; আর নিঃশেষ নিঃসঙ্গতা, শেষহীন।

রাস্তায় ভিড় ব্যস্ততা মত্ততা। আপিশে ময়দানে রেস্তোরাঁয়
কাজ খেলা নেশা, হাড়-ভাঙা সপ্তাহশেষে জুয়ো, জিন, দুপুরের ঘুম
সব অস্পষ্ট, আড়ষ্ট, শহর মূর্ছিত। বৃষ্টি,
বৃষ্টি। রাস্তায় ছায়ার ঠেলাঠেলি, দুঃস্বপ্নের হাড়হীন মিছিল।

অকায়, অকঙ্কাল কলকাতা, ছায়াময় ; স্বপ্নের মতো
স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বহীন। আমিও ছায়া, হাওয়ার ছোঁওয়ায়
কাঁপি দেয়ালে, পরদার আড়ালে ; দোলে আমার বুকের মধ্যে
বৃষ্টি আর ঝড়, বৃষ্টি আর ঝড়, রাত্রি আর দিন।

দময়ন্তী

বিনয় বৃদ্ধের বিদ্যা। দাম্ভিক যৌবন
মনে করে সূর্য তারই সম্ভোগের পথের প্রদীপ,
তারার সেনানী তারই রতি-হ্রস্ব রাত্রির পাহারা।
উদ্ধত সে,
নগণ্য সংকল্প তার নষ্ট হ'লে অদৃষ্টের দোষে
বিশ্বে নিন্দে, আপনারে অক্ষম ধিক্কারে
ক্ষত করে :
'আমি হৃতস্বার্থ, তাই সূর্য কেন্দ্রচ্যুত।'

সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন।
সহস্র চৈত্রের রাত্রি চৈত্ররথ-বনে
কাটায়েছি। সেই রাত্রি, পুঞ্জ-পুঞ্জ বসেন্তর মন্থিত অমৃত
যেদিন শরীরে তোর মুঞ্জরিবে, রে কন্যা আমার,
তোর পাণিপ্রার্থী হ'য়ে দেবত্রয় আসিবে সেদিন,
স্বয়ং মহেন্দ্র, অযোনিজ অগ্নি, কালান্তক যম।

স্বর্গ তোরে চায়, যজ্ঞ তোরে চায়, মৃত্যু তোরে চায়।
কিন্তু যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে জন্তুর গুহায়,
নাভিমূলে যজ্ঞবেদী, মৃত্যু আরো নিচে।
একদিন হংসদূত এসে
তারই সংগোপন মন্ত্র জ'পে গেছে তোর কানে-কানে,
শুনায়েছে প্রিয়তম নাম।
'প্রণাম, প্রণাম,
দেবগণ, ক্ষমা করো, ত্রাণ করো বিপন্নারে,
যেন চিনি তারে
সহস্র নলের মধ্যে, এই বর দাও।'

ফিরে যাবে দেবগণ। ওরে দেববিজয়িনী
যৌবনগর্বিণী কন্যা,

রে কন্যা আমার,
সেদিন মুখশ্রী তোর পূর্ণিমার মতো
আকর্ষিবে উচ্ছল অশ্রুর বেগ দু-জনের চোখে—
নয়, নয় বিচ্ছেদের শোকে,
আনন্দে, স্মৃতির স্রোতে, অতীতের উত্তরাধিকারে।

শোন তোরে বলি :
যে-ত্রিবলি
তোর জন্ম-সিংহদ্বারে প্রহরীপ্রতিম
আজো তা লাবণ্যময়, করুণ, মধুর।
যে-বন্ধুর
শরীর লজ্জিত, আজো, আপনার আকর্ষণ জেনে,
একদিন তার স্বয়ংবরে
স্বয়ং মহেন্দ্র, যম, বৈশ্বানরে
ক্ষুণ্ণ ক'রে যে-মর যৌবন
হয়েছিলো জয়ী,
তার দন্তে শ্বেত কেশ আজ ব্যঙ্গ করে,
কালাঙ্কিত কপোলে ললাটে
দেবতারই বিপরীত প্রতিপত্তি রটে।

তবু জৈব জাদু ব্যর্থ নয়।
যে-প্রণয়
বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব
মৃত্যু নেই তার।
আছে শুধু রূপান্তর, আয়ুর সর্পিল সোপানে-সোপানে
আছে নবজীবনের অঙ্গীকার।
যে-মুহূর্তে বাসনাবিহ্বল নীবি
খ'সে পড়ে, দেখা দেয় কালের প্রলয়-জলে
সর্বস্ব তিমির-তলে অলজ্জ বদ্বীপ,
অমনি থমকে কাল ; অদৃষ্টের করাল কুহেলি

দীর্ণ ক'রে আদিম পুরুষ
লভে সপ্তদশদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীরে ;
নির্ভয়ে উতরে
স্বগৃহে, স্বরাজ্যে, শান্তির কঠিন তীরে
পুনর্জিত স্বর্গের দুয়ারে।
শিহরে, শিহরে
আজিও সে-কথা মনে হ'লে
এ-জীর্ণ তনুর অন্তরালে
অকাল কঙ্কাল—
যে-মুহূর্তে তরঙ্গিত সময়-সলিলে
দ্বিখণ্ডিত হ'লো ক্রূর অদৃষ্টের শিলা,
ম্লান হ'লো হুতাশন, ব্যর্থ হ'লো যমদণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ—
বিশ্বাস না হয় যদি, জননীরে শুধায়ে দেখিস।

.

কিন্তু শেষ শিক্ষা আছে বাকি।
ক্লান্ত আজ স্বেচ্ছাচারী অজ্ঞান বৈশাখী
একদিন উন্মাদ নৃত্যের তালে-তালে
পঞ্জরে যে মুঞ্জরেছে, সংকীর্ণ কঙ্কালে
করেছে সকাম।
স্তব্ধ আজ রলরোল ; বিলোল আকাশগঙ্গা
ঝরে না ঝরে না আর নীহারিকা-স্বপ্নাকুল উৎসুক নিশীথে ;
অন্ধকারে, চন্দ্রালোকে, সন্ধ্যায় নিভৃতে
শরীরসীমান্ত বার-বার
বিচূর্ণ হয় না আর
উপপ্লাবী বাসনার বর্বর জোয়ারে।
জরার জটিল রেখা শরীরেরে
কঠিন পাথরে ঘেরে ;
এ-দুর্গম দুর্গে বন্দী, অনাক্রমণীয়,
নিশ্চিন্ত আমার সত্তা ; অনর্গল, অক্লান্ত ইন্দ্রিয়
এতদিনে রুদ্ধ হ'লো। অপরাহ্ণ ছিন্ন-অঙ্গ মেঘে

সবুজ হলুদ নীলে পশ্চিমে অন্তিম
বাসর সাজালো।
সূর্যাস্তের জাদুকর আলোর আয়না
হাতে নিয়ে সন্ধ্যা নামে : অন্ধকারে জ্বলে শুধু ছায়ার, স্মৃতির
অফুরন্ত ভিড়। এ-শরীর অবলুপ্ত জান্তব যৌবনে
হঠাৎ হারায়। কল্পনা বাড়ায় প্রেত-হাত,
দীর্ঘ ছায়া পার হ'য়ে অতীতেরে আনে সে ছিনায়ে।
সেখানে এখন
বিনষ্ট সংকল্প পূর্ণ, সার্থক ধিক্কৃত অনটন,
স্বার্থ-কেন্দ্র-চ্যুত বিশ্ব ফিরেছে আদিম মহিমায়।
জীবনের সমাপ্তিসীমায়
শেষ শিক্ষা এ-ই ছিলো বাকি।

শিখেছি বৃদ্ধের বিদ্যা। হাস্যকর, নশ্বর, একাকী,
ব'সে-ব'সে চেয়ে দেখি দাম্ভিক যুবক-দল চলে কলোচ্ছ্বাসে,
আর দেখি তোরে, ওরে
দেব-বিজয়িনী যৌবনগর্বিণী কন্যা, রে কন্যা আমার!
সহস্র নলের ছল ব্যর্থ হবে, ফিরে যাবে
ইন্দ্র, যম, বৈশ্বানর ; দুঃখের কুটিল
অরণ্য পুষ্পিত হবে চৈত্ররথ বনে
তোর যৌবনেরে ঘিরে। সেদিন আমার
কাল-কলঙ্কিত, তুচ্ছ শরীরে তাকায়ে
এ-কথা বিশ্বাস তোর কখনো হবে না—
সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন,
সহস্র চৈত্রের রাত্রি কাটায়েছি মুহূর্তের পরিপূর্ণতায়।
কবে এলো হংসদূত, ক'য়ে গেলো প্রিয়তম নাম,
স্বতঃশ্লথ নীবিবন্ধে আনন্দের ঢেউ তুলে—
সেদিন কখনো ভুলে
ওরে স্বয়ংবরা, তোর এ-কথা হবে না মনে—
যে-নারীর দেহ এই পৃথিবীতে তোর সিংহদ্বার

এ-প্রণয় তারই উত্তরাধিকার,
এ-বিশ্ববিজয় তারই কাহিনীর পুনরভিনয়।

তাই তো বিনয়
হৃতশক্তি বৃদ্ধের সম্বল।
অপেক্ষার যে-কলাকৌশল
ধৈর্যের যে-চতুরালি ধনী যৌবনের
ব্যঙ্গের বিষয়, দরিদ্র বার্ধক্য তাই দিয়ে
জীবনের ব্যবসার প্রাক্-প্রালয়িক
ভবিষ্যৎহীন দিনগুলি
সযত্নে সাজায়। অবাস্তব, তুচ্ছ, অনর্থক,
পরিত্যক্ত, বিবর্ণ পুতুল—
ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, আর
কয়েকটি হাড়—
এ-ই আমি, এ-ই আমি। তাই বলি
বলি বার-বার,
'অপেক্ষা শেখাও,
শেখাও ধৈর্যের নীরবতা,
এ-বিশ্বে ফিরায়ে দাও আদিম মহিমা।
আমার ইচ্ছার
চক্র থেকে মুক্ত করো সূর্য, চন্দ্র, সমুদ্র, পাহাড়,
তারার জলন্ত নৃত্য, পৃথিবীতে সবুজের খেলা,
আকাশের সোনালি-নীলের মেলা ;
মুক্ত করো জন্ম, মৃত্যু ; আমার প্রেমেরে—
প্রেমেরেও মুক্তি দাও ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে—'

আজ তোরে দেখে,
হে নবযৌবনা কন্যা, রে কন্যা আমার,
আমার প্রেমের মুক্তি। দেখি চেয়ে-চেয়ে—
আজিও করাল কাল ঘুমন্ত যেখানে—
পূর্ণিমা-মুখশ্রী তোর, পার্থিব অমরা।

তার জরা
সূর্যের মৃত্যুর মতো
নিশ্চিত, অথচ
অসম্ভব মনে হয় ; মনে হয়
কাল, তাও তুচ্ছ যেন, এ-বিশ্বের স্থবির ঘটনা,
রূপান্তরহীন।
লক্ষ রাত্রি, লক্ষ দিন
কেটে যায়— না কি আসে ফিরে-ফিরে
মৃত্তিকার মূর্তি দিতে চিরন্তনী দময়ন্তীরে ?

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
শেষ তব শীর্ণ ছায়া শুষে নিলো আজ
শুভ্র সভ্যতার সূর্য।
করো, জয়ধ্বনি করো,
ছিন্ন হ'লো ঘন অন্ধকার
মেঘবর্ণ মেখলা লুণ্ঠিত—
ঐ এলো প্রেমিক বণিক-বীর
তব নগ্ন কৌমার্যেরে ত্বরিতে করিতে
সভ্যতাসন্তানবতী
দীর্ণ তব হৃৎপিণ্ডের রক্তের যৌতুকে।

হে আফ্রিকা, হও গর্ভবতী।
আনো, আনো বাণিজ্যের জারজেরে
দ্রুত তব অঙ্কতলে।
পূর্ণ হোক কাল।
স্থূলোদর লোলজিহ্ব লোভ
রক্তস্ফীত বাণিজ্যের বীজ
হোক, পূর্ণ হোক।

করো,
বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত-পঙ্গু, নপুংসক বিকৃত জাতক,
তার জয়ধ্বনি করো।
উন্মত্ত কামার্ত ক্লীব, আত্মরক্ষা আত্মহত্যা তার।

হে আফ্রিকা,
অবসন্ন বণিকবৃত্তির নিহিত মৃত্যুর 'পরে
বিদ্যুৎ-চমকে
কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে।
হে আফ্রিকা, হে গণিকা-মহাদেশ,
একদিন তব দীর্ণ বিষুবরেখার
শতাব্দীর পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার
উদ্দীপিত হবে তীব্র প্রসব-ব্যথায়।
করো,
মৃত্যুরে মন্থন করি' নবজন্ম কাঁপে থরোথরো,
জয়ধ্বনি করো।

নির্মম যৌবন

যৌবন করে না ক্ষমা।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গীকারে করে মনোরমা
বিশ্বের নারীরে। অপরূপ উপহারে কখন সাজায়
বোঝাও না যায়।
তার সে-পসরা
কিছুতেই যায় না গোপন করা।
বারণ শোনে না,
বিচার করে না কিছু, দূর ক'রে দেয় সব ভেদ,
বিশ্বজয়ী এমন দুর্দান্ত সেনা
এমন নির্মম সাম্যবাদী
আর তো দেখিনে।

আসে পথ চিনে
প্রাসাদে কুটিরে মাঠে পল্লীর নিভৃতে
শহরের কুৎসিত বস্তিতে।
নিশ্চিত সে মৃত্যুর মতোই,
রক্ষা নেই তার হাতে, অমৃতে অথই
হবেই যে-কোনো নারী-দেহ
কোনো-একদিন। দয়া নেই, ক্ষমা নেই ;
জীবনের কিছুকাল— নারী যে, সে রানীও হবেই।
এমনকি পথে-পথে বেড়ায় যে ভিখারিনী মেয়ে
আঁস্তাকুড়ে খাদ্যকণা খেয়ে,
অতি জীর্ণ জঘন্য মলিন যার বাস
তাকেও ছাড়ে না
যৌবনের ক্ষমাহীন সেনা।
তাকেও সুন্দর করে, তাকেও সাজায়,
লজ্জা দেয়, ভঙ্গি দেয়, দেহ ভ'রে তোলে
লাবণ্য-হিল্লোলে।
বোঝে না যে এতই সে নিরুপায়
দেহ যত শুষ্ক হবে, যত মৃতপ্রায়
তত তার লাভ।
এই আবির্ভাবে
শুধু তার বিপদ বাড়াবে।
উচ্ছিষ্টের কণা
কুড়িয়ে পাওয়ায় যার জীবনসাধনা
তারে কি মানায়
যৌবনের উন্মীলন কানায়-কানায়।
চায়নি সে, চায়নি সে, নিতান্তই ক্ষুন্নিবৃত্তি যার
সবচেয়ে বড়ো কাম্য, এ যে তার অসহ্য জঞ্জাল,
উপরন্তু বিড়ম্বনা।
দেহে যার আবরণ নেই, শয্যা যার পথের ঘৃণিত আবর্জনা
তার 'পরে এ কী অত্যাচার !

পশুতে পাখিতে গাছে ঘাসে
আনন্দিত পূর্ণতায় যৌবন বিকাশে,
হিরণ্ময় পাত্রে ঝরে স্বর্ণ মদিরা।
ওরাও যে সুন্দর আধার
তাই তো ওদের আছে জন্ম-অধিকার
যৌবনের জাদুকর রূপান্তরে।
বিশ্ব ভ'রে চেয়ে দেখি সুন্দরের লীলা
এর মধ্যে ক্লেদাক্ত মাটির ভাঁড়
বিশ্বের কুৎসিত ক্ষত ঐ ভিখারিনী।
যার কিছু নেই, তার যৌবনেও নেই অধিকার
অতি সত্য এই কথা,
তবু প্রতিদিন এর ঘটায় অন্যথা
নির্মম নিয়তি।
ভিখারিনী, সেও যে যুবতী
এ বেসুর, এ নিষ্ঠুর অসংগতি
কেমনে সহিছে বিশ্বপ্রকৃতির বীণা
আমি তো বুঝি না।

ম্যাল-এ

'আপনারা কবে? আমরা এসেছি সাতাশে।
ওকভিলে আছি। আসবেন একদিন।'—
শাড়ির বাঁধনে শোভে শরীরের ইশারা,
ঠোঁটের গালের রঙের চমকে কী সাড়া!
কী করুণ, আহা, অতরুণ তনু সাজানো!
সবি বুঝলুম। ইচ্ছে হ'লে যে বাংলাও পারে বলতে
তাও বুঝলুম। মহৎ যত্নে অ্যাকসেন্টগুলো মাজানো
ব্যর্থ হবে কি তাই ব'লে, বলো!

নিখুঁত বাংলা ফোটে ফিরঙ্গ রঙ্গে,
ইংরেজি স্বরে তির্যক গতিভঙ্গে।
আমরা চমকে থমকে দাঁড়াই, হয়তো বা কারো জুতোই মাড়াই,
বাংলা শুনেই সার্থক শ্রম চৌরাস্তায় সন্ধেবেলায় হাঁটলে।
ভাবি শুধু এই, অমনি স্বরেই বেরোবে কি বুলি হঠাৎ চিমটি কাটলে?

২

আজকে না-হয় ম্যালেই চলো।
ভারি সুন্দর বিকেল— না?
মিমির জন্যে কী-খেলনা
কিনবে? দোকানে গেলেই হ'লো।
তোমার নতুন কী চাই, বলো?
কিচ্ছু চাইনে? এমন মিথ্যে
কী ক'রে বললে? কপট অঙ্ক
রটায় আমার কত কলঙ্ক,
তুমিও কি তাই শুনে ঘাবড়ালে?
গণিকা-গণিত লক্ষপতিকে
খোশামোদ করে, পেয়ে বেগতিকে
আমাকে নিত্য করে নাজেহাল;
কখনো একটু পিঠ চাপড়ালে
খুশি হয় মন, পানি পায় হাল—
এ ছাড়া আমার, বিশ্বাস করো, আর কোনো দোষ নেই চরিত্রে

আজো কি মানবে গণিতের কড়া জুলুম
জাদুকর রোদে এমন বিরল বিকেলবেলায়?
হীন অঙ্কের মেনে দাসত্ব
হারাবো কি শেষে জীবনস্বত্ব?
বেঁচে থাকবার এই কি শর্ত? তুমিই বলো!
সিঁদুরে শাড়িটা প'রে নাও তাড়াতাড়ি। ম্যালেই চলো

. মলিন হিশেব ঋণের কুঁজও আজকে মিলায়
তুষার-তাঁবুর দড়ি-ছেঁড়া তিব্বতি এ-হাওয়ায়,
ভোলো প্রতিদিন-পুঞ্জিত ঋণ, ভোলো বেমালুম
জোড়াতালি-দেয়া ছেঁড়াখোঁড়া দিন। কপাল ভালো,
খালি প'ড়ে আছে আস্ত বেঞ্চি।

ভোলো, ভয় ভোলো।

যে-ভয় জীবনে ফণিমনসার বন,
যে-ভয়ে নিত্য মেনে চলি মহাজন,
যে-ভয়ে কখনো গান্ধীর কভু অরবিন্দের চরণ-শরণ,
ত্যাগের কন্থা যোগের পন্থা মানস-বরণ,
দিশি সিনেমায় ঋষি-মহিমায় ইচ্ছাপূরণ,
সত্য, শিব ও সুন্দরে ঢাকি জীর্ণ জীবন, জীবনে-মরণ,
যে-ভয়ে নিত্য ব্যর্থ কর্ম, মিথ্যাচরণ,
কেননা জীবন কেবলি জীবনধারণ,

জীবিকাই, হায়, জীবন। আজ

সে-ভয় ভোলো।

দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো পায়ের তলায় মেঘের মেলায় আলো মিলায়,
উত্তর-জোড়া তুষার-চূড়ায় খেয়ালি বিকেল আগুন ছড়ায়,
ক্ষণিক রঙের বণিক সূর্য নিবলো এবার। হারালো তুষার-মোড়া উত্তর,
হারালো আকাশ হঠাৎ কুয়াশা লেগে, বারুদগন্ধী মেঘে।

ছায়ামুড়ি দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো
জটিল জনতা প্রগল্‌ভ গতিশীল,
স্বৈরী মেঘের পূর্ণ স্বরাজ
দেখেই কি ওরা এমন দরাজ,
স্বেচ্ছাচারের উচ্চচূড়ার জঙ্গমতা
বঙ্গমাতার সন্তানেরাও আজ কি পেলো?

মেঘ-মুড়ি দিয়ে জ্বললো আলো,
ল্যামপোস্টগুলো পরেছে আলোর গোল টুপি,
ঠিক খৃষ্টান দেবদূত!
এসো, কাছে এসো, শোনো কথা চুপি-চুপি,

এ কি নয় অদ্ভুত
তুমি আর আমি ব'সে আছি এই কুয়াশা-মোড়া
চৌরাস্তায়, মেঘের মধ্যে,
সব বেয়াদব চোখ মুছে গেছে এ-ঘন মেঘে,
এবার বলো !
এখনি হয়তো হঠাৎ হাওয়ার আঘাত লেগে
মেঘ কেটে যাবে ; কেটে যাবে এই গণিত-অতীত বিরল ক্ষণ।
এখনি বলো।　　　　ঐ তো এলো
নিষ্ঠুর হাওয়া মেঘের ঝাঁটা, কুয়াশা-কাটা !
আকাশ ফেটে কি ফুটলো তারা ? লাগলো হাওয়ার তীব্র তাড়া ?
এবার তাহ'লে ফিরেই চলো। আজো কি হ'লো
তোমার আমার অনেকদিনের অঙ্গীকারের উদ্‌যাপন ?

সাগর-দোলা

ছোটো ঘরখানি মনে কি পড়ে,
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে ? মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত হাওয়ার ঝড়ে
সাগর-দোলা,
সারাদিনরাত ঢেউয়ের তোড়ে
নাগর-দোলা,
আকাশ-মাতাল জানালা খোলা
দিগন্ত থেকে দিগন্তরে,
দিগন্ত-জোড়া সাগর ভ'রে
ঢেউয়ের দোলা।
সারাদিনরাত হাজার ঢেউয়ের উচ্চস্বরে
অন্ধ অবোধ হাওয়ার ঝড়ে

কী যে লুটোপুটি ছুটোছুটি ঐ ছোট্ট ঘরে
মনে কি পড়ে ? মনে কি পড়ে ?
কত কালো রাতে করাতের মতো চিরে
ভাঙাচোরা চাঁদ এসেছে ফিরে
তীক্ষ্ণ তারার নিবিড় ভিড়ে
ভাঙন এনে,
কত কৃশ রাতে চুপে-চুপে চাঁদ এসেছে ফিরে
সাগরের বুকে জোয়ার হেনে
তোমারে আমারে অন্ধ অতল জোয়ারে টেনে
মনে কি পড়ে ?
কত উদ্ধত সূর্যের বাণে তুমি আর আমি গিয়েছি ছিঁড়ে
কত যে দিনেরে চুম্বন টেনে দিয়েছি মুছে
কত যে আলোর শিশুরে মেরেছি হেসে
সেই ছোটো ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা,
মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত ঢেউয়ের দোলা,
সমুদ্র-জোড়া দিগন্ত থেকে দিগন্তরে
সারাদিনরাত জানালা খোলা।
দস্যু হাওয়ার উচ্চস্বরে
তপ্ত ঢেউয়ের মত্ত জোয়ার-জ্বরে
কী যে তোলপাড় দাপাদাপি ঐ ছোট্ট ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে ঢেউয়ের দোলা,
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে হাজার ঝড়ে
কত সমুদ্র তপ্ত জোয়ার-জ্বরে
মনে কি পড়ে ?

কত মৃত চাঁদে এনেছি ফিরায়ে রাত্রিশেষে
কত বর্বর শিশু-সূর্যেরে মেরেছি হেসে
ঘন-চুম্বন-বন্যায় কোন অন্ধ অতলে গিয়েছি ভেসে
মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা,
মনে কি পড়ে ?

ব্যাং

বর্ষায় ব্যাঙের ফুর্তি। বৃষ্টি শেষ, আকাশ নির্বাক ;
উচ্চকিত ঐকতানে শোনা গেলো ব্যাঙেদের ডাক।

আদিম উল্লাসে বাজে উন্মুক্ত কণ্ঠের উচ্চস্বর।
আজ কোনো ভয় নেই— বিচ্ছেদের, ক্ষুধার, মৃত্যুর।

ঘাস হ'লো ঘন মেঘ ; স্বচ্ছ জল জ'মে আছে মাঠে।
উদ্ধত আনন্দগানে উৎসবের দ্বিপ্রহর কাটে।

স্পর্শময় বর্ষা এলো ; কী মসৃণ তরুণ কর্দম !
স্ফীতকণ্ঠ, বীতস্কন্ধ— সংগীতের শরীরী সপ্তম।

আহা কী চিক্কণ কান্তি মেঘস্নিগ্ধ হলুদে-সবুজে !
কাচ-স্বচ্ছ ঊর্ধ্বদৃষ্টি চক্ষু যেন ঈশ্বরেরে খোঁজে

ধ্যানমগ্ন ঋষি-সম। বৃষ্টি শেষ, বেলা প'ড়ে আসে ;
গম্ভীর বন্দনাগান বেজে ওঠে স্তম্ভিত আকাশে।

উচ্চকিত উচ্চ সুর ক্ষীণ হ'লো ; দিন মরে ধুঁকে ;
অন্ধকার শতচ্ছিদ্র একছন্দা তন্দ্রা-আনা ডাকে।

মধ্যরাত্রে রুদ্ধদ্বার আমরা আরামে শয্যাশায়ী ;
স্তব্ধ পৃথিবীতে শুধু শোনা যায় একাকী উৎসাহী

একটি অক্লান্ত স্বর ; নিগূঢ় মন্ত্রের শেষ শ্লোক—
নিঃসঙ্গ ব্যাঙের কণ্ঠে উৎসারিত— ক্রোক, ক্রোক, ক্রোক।

ইলিশ

আকাশে আষাঢ় এলো ; বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি
বৃষ্টিতে ধূমল ; পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।

মধ্যরাত্রি ; মেঘ-ঘন অন্ধকার ; দুরন্ত উচ্ছল
আবর্তে কুটিল নদী ; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোটো নৌকাগুলি ; প্রাণপণে ফেলে জাল, টানে দড়ি
অর্ধ-নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস সর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ-উৎসব।

জোনাকি

এ কী
জোনাকি !
তুই কখন
এলি বল তো !
একলা
এই বাদলায়
কেন কলকা-
তায় এলি তুই ?
(এই সারারাতজ্বালা চিরদীপমালা দেয়ালি-আলোয় !)
তোর সঙ্গী
সব পাড়াগাঁর
পথে সারা রাত
ঘন অন্ধ-
কারে জ্বলছে ।
কোন সরকার
দর- কারে তার
এই শহরে
তোকে শফরে
আজ পাঠালো !
(এই চাঁদ-তারা-ঝরা ছায়া-ছেঁড়া চির-দেয়ালি-আলোয় !)
এ যে কলকা-
তার ফুটপাত,
নেই ফাঁকা মাঠ
নেই ঝোপঝাড়
নেই জঙ্গল,
তুই ফিরে যা
তোর পাড়াগাঁর
পচা পুকুরের

পাড়ে   থমথমে
কালো   রাত্তিরে
কর   ঝলমল—
(জল,   চঞ্চল তারা তারা-ভরা কালো আকাশ-তলে।)
এই   কলকা-
তায়   রাত নেই,
নেই   চুপচাপ ;
তারা   তাড়ানোয়
ঘুম   কাড়ানোয়
ভরা   সারা রাত।
তুই   এ-ঘরে
কোন   বিঘোরে
এলি   দেয়ালে
ছাদে   জানলায়
খাটে   আলনায়
ঘুরে   মরতে !
(এই   আশবাব-ঠাশা হাঁশফাঁশ-করা গুমোট ঘরে !)
আমি   একলা
এই   বাদলায়
শুয়ে   দেখছি
তোর   ঝিকমিক
জ্বলে   মশারির
কোণে   চিকচিক,
ঘুম   আসে না।
ভাবি,   ঘুটঘুট
ঘোর   রাত্তিরে
তোর   সঙ্গীরা
তোকে   ডাকছে ;
তুই   ফিরে যা—
(তোরা   মাঠ-ভ'রে-ফোটা সবুজ তারার দেয়ালি জ্বালা।)

যা ফিরে যা
তোর পাড়াগাঁয়—'
না, না, যাসনে
তুই এখনই ;
আরো একটু
থাক, চক্ষু
ভ'রে দেখে নিই—
(এই দেয়ালি-আলোয় চঞ্চল কলকাতার রাতে !)
তবু এটুকুই
বলি ভাগ্য
আজ এলি তুই
এই রাত্রে—
চোখে ঘুম নেই ।
সারা শহরে
আমি একলা
শুধু দেখলুম
তোর পাখনার
আলো ঝিলমিল
যেন ছোট্ট
তারা ফুটলো,
যেন স্বপ্নে
দিলি ক্ষণিকের
সুখ- সঙ্গ
তুই জোনাকি !

মায়াবী টেবিল

তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, মায়াবী টেবিলে
সংকীর্ণ আলোর চক্রে মগ্ন হও, যে-আলোর বীজ
জন্ম দেয় সুন্দরীর, যার গান সমুদ্রের নীলে
কাঁপায়, জ্যোছনায় যার ঝিলিমিলি-স্বপ্নের শেমিজ
দিগ্বিজয়ী জাহাজেরে ভাঙে এনে পুরোনো পাথরে।
তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, যে-দীপের ছায়া
ঘাস, গাছ, রোদ্দুরের অন্তহীন আশ্চর্য কাপড়ে
পৃথিবীরে রূপ দেয়, যে-রূপেরে লক্ষ হাতে হাওয়া
যদিও নিত্যই ছেঁড়ে, তবু পাতাঝরার চীৎকার
হার মানে, স্তব্ধ হয়, ছন্দ পায় যার প্রতিভায়।
তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, করো অঙ্গীকার
সেই আলো, যে দেয় জীবনে মুছে, যৌবনে নিবায় ;
রঙের তরঙ্গে বেঁধে তপ্ত ঘন খনির কোরকে—
ধাতুর প্রাণের পদ্মে, পাথরের রক্তের শিরায়
জ্বালায় অব্যর্থ, ক্রূর, অফুরন্ত চোখের হীরকে।

দ্রৌপদীর শাড়ি

রোদ্দুরের আঙুলে আঁকা
মেঘের চেরা সিঁথি
হঠাৎ খুলে দিলো স্মৃতির
অন্তহীন ফিতে।
এমনি এক মেঘেলা দিন
সীমান্তের শাসনহীন,
ভবিষ্যৎ দেখা না যায়,
অতীত হ'লো হারা।
দুঃস্বপনে পড়িলো মনে
দ্রৌপদীর শাড়ি।

সেদিন মেঘে সোনার পাড়,
রৌদ্র ভিজে-ভিজে ;
গাছের গায়ে আছাড় দেয়
হাওয়ার হিজিবিজি।
দুপুর যেন বিকেল, আর
বিকেল হ'লো অন্ধকার ;
সন্ধ্যাকাশে উচ্চহাসে
সূর্য পেলো ছাড়া।
দুঃশাসন করিলো পণ
দ্রৌপদীর শাড়ি।

ভাঙলো ঘুম, লাল আগুন
ধৈর্যহীন শিরায়
উল্লসিত হুল্লোড়ের
আনলো কড়া নাড়া
আকাশে তারই স্বৈরাচার ;
কখনো নীল মেঘের ভার,
আলোর বাঘ কখনো ছায়া-
হরিণে করে তাড়া ;
আশার দাঁত চিবিয়ে ছেঁড়ে
দ্রৌপদীর শাড়ি।

স্বর্গে আর মর্ত্যে যেন
বাঁধিয়া দিলো সেতু
অচির-পরিবর্তনের
তুমুল মত্ততা।
আলো-ছায়ার খেলার ঘরে
ভীষণ ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ে,

বজ্র শুনে লাফিয়ে ওঠে
বিদ্যুতের খাঁড়া ;
মুষলধারে সাহস টানে
দ্রৌপদীর শাড়ি ।

প্রতিশ্রুত হাতুড়ি এলো
অন্ধকারে ছুটে,
বাড়ালো হৃৎপিণ্ড তার
চাঁদের মতো মুঠি ।
আকাশ ভ'রে উঠলো সোর,
মেঘের ঘোর, জলের তোড় ;
মন্ত্র-পড়া অন্তরাল
দিলো না তবু সাড়া
অসম্ভব দ্রৌপদীর
অন্তহীন শাড়ি ।

রূপান্তর

দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
রাত্রি মোর জ্বলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে ।
ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা ।
জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায়,
ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন ।
দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণে হোক মৃত্যুর সংগম,
মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ, মন ।

কোনো মৃতার প্রতি

'ভুলিবো না'— এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে
জীবন করে না ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক।
তোমার চরম মুক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মুখশ্রী-মায়া মিলাক, মিলাক
তৃণে-পত্রে, ঋতুরঙ্গে, জলে-স্থলে, আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
জ্বেলে রাখি এই রাত্রে— তুমি ছিলে, তবু তুমি ছিলে

পৌষপূর্ণিমা

কিশোর-ঈষৎ-শীত কোনো রাত্রে যদি-বা দৈবাৎ
সচ্ছল শরৎ সাজে, আশ্বিনের ইচ্ছারে যদি-বা
পূর্ণ করে অপুষ্পক অঘ্রানের প্রচ্ছন্ন প্রতিভা

রাশি-রাশি সেই ফুলে, যে-ফুলে কখনো কোনো হাত
আনেনি স্পর্শের জরা; যার স্পর্শ, যত বাড়ে রাত,
তত নামে নারী হ'য়ে, রক্তমাংসহীন, অপার্থিবা,

অসীমচুম্বনী, তবু চুম্বনের অতীত, অতীবা;—
যে-গাছের সেই ফুল, তার নীল উল্লাস হঠাৎ
আকাশের শিরা দেয় ভ'রে: —তাতে কী? কেউ কি ছাখে?

...বালিগঞ্জে বাড়ির গম্ভীর ভিড় যদি কোনো ফাঁকে
মেলে দেয় একটু সবুজ, ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে
অচন্দ্রচেতন যুবা ঘণ্টা দুই ব্যাডমিণ্টন খেলে,

রক্তমাংস তৃপ্তি খোঁজে খাদ্যে, তাপে, ব্যায়ামে, আরামে,
সর্বশেষে ঘুমের ঘনিষ্ঠ কোলে ; একই নিদ্রা নামে
বস্তির ফুর্তিতে আর প্রাসাদের মর্মর বিষাদে :

আকাশে অসীম চাঁদ কলকাতায় শুধু বাদ সাধে
কুখ্যাত পাখির ঘুমে, কর্কশ চীৎকারে দিয়ে ডাক
ফুটপাতের গাছের বিছানা ছেড়ে উড়ে যায়, নীড়

খোঁজে মেঘের নরম মোমে, ব্যর্থ হ'য়ে তীক্ষ্ণ শাঁখ
বাজায়ে নিখাদ কণ্ঠে— উতরোল, উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির,

চাঁদেরে বন্দনা করে শুধু কাক— শুধু কাক— কাক।

প্রত্যহের ভার

যে-বাণীবিহঙ্গে আমি আনন্দে করেছি অভ্যর্থনা
ছন্দের সুন্দর নীড়ে বার-বার, কখনো ব্যর্থ না
হোক তার বেগচ্যুত পক্ষমুক্ত বায়ুর কম্পন
জীবনের জটিল গ্রন্থিল বৃক্ষে : যে-ছন্দোবন্ধন
দিয়েছি ভাষারে, তার অন্তত আভাস যেন থাকে
বৎসরের আবর্তনে, অদৃষ্টের ক্রূর বাঁকে-বাঁকে,
কুটিল ক্রান্তিতে ; যদি ক্লান্তি আসে, যদি শান্তি যায়,
যদি হৃৎপিণ্ড শুধু হতাশার ডম্বরু বাজায়,
রক্ত শোনে মৃত্যুর মৃদঙ্গ শুধু ; —তবুও মনের
চরম চূড়ায় থাক সে-অমর্ত্য অতিথি-ক্ষণের
চিহ্ন, যে-মুহূর্তে বাণীর আত্মারে জেনেছি আপন
সত্তা ব'লে, স্তব্ধ মেনেছি কালেরে, মূঢ় প্রবচন
মরত্বে ; যখন মন অনিচ্ছার অবশ্য-বাঁচার
ভুলেছে ভীষণ ভার, ভুলে গেছে প্রত্যহের ভার।

অন্য প্রভু

রাজত্ব দিয়েছো, প্রভু, সকলেরে : শুধু নয় বাংলার জঙ্গলে
আগুন-রঙের বাঘ, আল্পসের কল্পনা-কৈলাসে
দারুণ ঈগল, বারুণী বরফে তপ্ত তিমি, শুধু
দীপ্ত দৃপ্ত দুর্জয়েরে নয়, দিয়েছো সবারে স্বত্ব
সহজাত রাজত্বের : ঘোলা-জল ধোবার ডোবায়
গলা-ডোবা কালো মোষ ভাদ্রের রোদ্দুরে, গলা-ফোলা, গলা-খোলা ব্যাং
বৃষ্টিশেষ বিকেলের হলুদ রোদ্দুরে, মেঘলা দুপুরে
আকাশে একলা কাক, কার্তিকের রাত্তিরের পোকা, মারীমত্ত মাছি,
রাক্ষস টিকটিকি : —সকলেরে রাজত্ব দিয়েছো, প্রভু, সকলেরই
প্রভুত্ব নিয়েছো মেনে। ...এ-স্বারাজ্য-সাম্রাজ্যে শুধু কি
বঞ্চিত শুধু কি আমি? ...আমি কবি! ...শুধু আমি
রাজ্যচ্যুত...নির্বাসিত? ...অন্ন, শুধু প্রত্যহের অন্ন দিয়ে
আমার রাজত্ব নিলে কেড়ে? শুধু আমি প্রতি মুহূর্তের
অস্তিত্বের অস্বস্তির দাস? ...সত্যি তা-ই? ...না কি আমি, কবি-আমি,
কোলের কুকুর কিংবা জুয়োর ঘোড়ার মতো, সব,
সব স্বত্ব হারায়েছি অন্য, হীন প্রভু মেনে নিয়ে!

মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে

এ নয় গানের দিন। বৎসরের হ্রস্বতম দিনে
স্বল্পতম সূর্যালোক, ন্যূনতম তাপ আর কুয়াশায় আচ্ছন্ন আভার চাঁদ
দুরাশারে পশায় কফিনে, আশারে মিশায় হতাশায়।
তবু তো শীতেই আশা, দুরাশাও, দাঁড়ায় আবার;
দাঁড়ায় মুমূর্ষু, মৃত, নামমাত্র দিনের খবরে,
বৎসরের হ্রস্বতম দিনের কবরে জন্মে
আবার দ্বিতীয় দিন, হ্রস্বতায় বৎসরে দ্বিতীয়।
দিনে-দিনে ছোটো হ'য়ে দিন সবচেয়ে ছোটো দিন আনে,

তারপর দিনে-দিনে আরো দিন, আরো, বড়ো, আরো আলো, আরো তাপ, আরো !
বাড়ো, দিন, বাড়ো !
এই গান— যদি একে গান বলো, আমার তো তা-ই মনে হয়—
এই গান গায় কাক, শালিক, চড়ুই
তীক্ষ্ণ স্বরে, শঙ্খস্বরে,
শেষরাতে আকাশে যখন রাতের লাঙুল ধ'রে টানে
দিগন্তের তল থেকে দিনের আঙুল, আর অন্ধকার
তাদেরই পাখার মতো ছটফট করে—
মানে, ঐ পাখিদের। আবার সন্ধ্যায় গায় একই গান—
আরো দিন, আরো !—
একই কাক, শালিক, চড়ুই, ফুটপাতের গাছের ডালের
সবচেয়ে উঁচু, লঘু সবুজ বিনুনি থেকে যেই
খ'সে পড়ে রোদ্দুরের সোনার চিরুনি, আর অন্ধকার
তাদেরই পাখার রঙে পৃথিবীরে ঢাকে—
মানে, ঐ পাখিদের।

তবে কেন বলো গান নেই ?
পাখিরা তো গান গায়, হোক কাক, চড়ুই, শালিক,
তবু পাখি, তবু গান।

কেউ-কেউ আরো বলে।
বলে, এ তো ফুর্তির ঋতু। বাংলায় শীত মৃদু, শরীরের সুখ
এই তো দু-মাস। এই তো দু-দিন
কনকনে কড়া শীত, আকাশ নরম-নীল, ঝকঝকে অথচ নরম রোদ ;
একটু স্বাধীনভাবে
উত্তুরে হাওয়ার স্বাস্থ্যে বছরের যে-কোনো ইচ্ছারে মেটাও, মেটাও।
মেটাও, মেটাও !
সব দাও, সব নাও !

না-ও ফিরে পেতে পারো, না-ও ফিরে যেতে পারো এ-ইচ্ছায় আগামী বছর ;
(যে-শীতে আরেক দল মেয়েদের হল্লা ডাক দেবে
হয়তো আরেক দল যুবকের হুল্লোড়ে, সে-শীত
কাছেই— কাছেই)
যদি আজ আর-কিছু না-ও থাকে, ইচ্ছা তো আছেই ;
আর যদি ইচ্ছা থাকে শুধু, আর-কিছু না-ও থাকে, তবে,
তবু নাও, নাও, চেয়ে নাও,
চেয়ে ছাখো, যাও !
কলকাতায় ক্রিসমাস, দিল্লিতে উল্লাস, আর শান্তিনিকেতনে
মেলা, খেলা, সারাবেলা— বেলা যায়, যায় !

—যাক।

বেলা তো গেছেই, আমার তো বেলা গেছে। বুড়ো হ'য়ে উড়ো-উড়ো মন
মানায় না আর, মানায় না ইচ্ছার হাওয়ার তাড়া :
শুধু শুনে যেতে হয়, শুধু মেনে নিতে হয়, তাই
আমি তাই মেনেই নিয়েছি এই উত্তরের ঠাণ্ডা ঘর,
রাস্তায় গণ্ডগোল রাত্তির বারোটা অব্দি ;
ঘেঁষাঘেঁষি-প্রতিবেশীদের
কয়লা-ধোঁয়ার ফাঁসি, পচা-মাছ-রান্নার প্রবল
গন্ধের উথাল।
আমি, বুড়ো, প্রায়-বুড়ো, তাই সারাদিন
কাটাই চেয়ারে ব'সে ;
লিখতে না-পারি যদি, পড়ি, বই পড়ি ;
আর যদি আলো কম লাগে— যেহেতু আমার চোখ
তত ভালো নেই আর—
তবে চুপ ক'রে ব'সে ভাবি, ভাবি ; আর
ভাবতেও ক্লান্ত যখন লাগে, জানলা-বাইরে
রাস্তায় তাকিয়ে দেখি, নয়তো, রাত্তিরে
শুয়ে-শুয়ে চিরচেনা অথচ অচেনা
দেয়ালে তাকিয়ে থাকি।

হয়তো এখন
মানবে যে শীত নয় সুখের সময়, অন্তত আমার নয়।
শীত···শীত।
হাতে ঠেকে টেবিলের ঠাণ্ডা কাঠ, পায়ে ঠেকে ঠাণ্ডা মেঝে,
পিঠে বেঁধে ঠাণ্ডা হাওয়া ; ঠাণ্ডা, অন্ধকার,
বন্ধ এই উত্তরের ঘরে।
দিন আরো ছোটো আর আলো আরো কম এই ঘরে,
খাতা খোলা প'ড়ে থাকে, তোলা থাকে বই :
কই,
সকাল দেরিতে এত, সন্ধ্যা আসে এতই সকালে,
সময় বা কই !
দিন নেই, আলো নেই, মন নেই, কিছুরই সময় নেই, যদি-না ঘুমের ; তবু
চেয়ারেই ব'সে থাকি— বিছানাটা আরো ঠাণ্ডা ব'লে ;
ব'সে-ব'সে কিছুই হয় না ব'লে
শুয়ে পড়ি রাত্রে তাড়াতাড়ি, কুঁকড়ে লুকোই
পশুর গুহার মতো লেপের গহ্বরে ;
আর যতক্ষণে
বিছানা গরম হয়, মনে-মনে ভাবি—
কী ? কী ভাবি ?
আমি, বুড়ো, প্রায়-বুড়ো, কী আছে আমার
কী আছে ভাবার আর
তীব্র স্মৃতি ছাড়া,
তীব্র, তিতো, মত্ত স্মৃতি ছাড়া ?

এই শীতে গান ?

এই শীতে গান। এই শীতে গান নেই, যদি-না বানাই আমি,
কেননা শালিক, কাক, চড়ুয়ের ডাক
গান নয়— যদিও আমার কানে গান—

পাখিরে দেয়নি গান, পাখিরে দিয়েছে শুধু ডাক ;
আমারে দিয়েছে গান, আমি তাই গানেরেই ডাকি,
ডাকি শীতে, শীতের শত্রুতা সহ্য ক'রে, পাংশু, কৃশ দিনে,
রক্তশোষা অসহ্য সন্ধ্যায়।
অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে সারাদিন ধ'রে ব'সে-ব'সে
আমি, বুড়ো, প্রায়-বুড়ো, ডাকি— বাড়ো,
বাড়ো গান! এখনো হয়নি শেষ, আছে আরো,
আরো গান! আরো দিন!
দিনে-দিনে ছোটো হ'য়ে দিন সবচেয়ে ছোটো দিন এনে
দিনে-দিনে বড়ো হয় ; মাঝখানে একটু নিশ্বাস নিয়ে
আকাশের উত্তলে হেলান দেয় উত্তরের দিকে মুখ ক'রে
মকরক্রান্তির সূর্য :
আবার প্রখর পথ, খাড়া সিঁড়ি, ঝিরিঝিরি ফাল্গুনের পরে
বৈশাখের সুখের শিখর ;
তার আগে একটু জিরিয়ে নেয়, ফিরে চায়, দূরে চায়, ক্রান্তির
ক্লান্তিরে বিছায়
উত্তরায়ণের সূর্য।
তাই গান, আজও গান : যেহেতু আমিও
ফিরে চাই, দূরে চাই, ক্রান্তির ক্লান্তিরে বিছাই
মাংসহীন শীতের শরীরে ; যেহেতু আমার
যদিও যৌবন গেছে, তবু আছে, কিছু দেরি আছে
মাংসহীন শেষ শূন্য শীতের মুক্তির ; যেহেতু আমারে—
যদিও অধৈর্যহীন— তবু আজও শিরার দড়িতে বাঁধে
জীবনের প্রয়োজনে : তাই আমি আয়ুর সিঁড়িতে ব'সে
শুনি পিছে স্মৃতির প্রপাত—
অস্থির প্রলাপ!—আর দেখি সামনে পথের
কড়া, খাড়া, চড়া রেখা, যত চড়া তত বাঁকা, তত একা ; তাই
এক জন্ম শেষ ক'রে আরেক জন্মের আগে—
আর-কিছু নয়— শুধু চিন্তারে বিছাই
দিনের টেবিলে আর রাতের লেপের তলে ; আর শেষরাতে

মুখ-ঢাকা বুক-চাপা অন্ধকারে ঘুম ভেঙে মনে হয়, নেই—
নেই— কিছু নেই—
শুধু এই ভার,
শুধু এই ভার ছাড়া,
আমার চিন্তার ভার ছাড়া।
তাই গান,
বানাতেই হবে গান, বাস্তবের স্বাস্থ্যে ফিরে যেতে।

কিন্তু কোন গান?

যৌবন যখন ছিলো, যৌবনেরে
করেছি বন্দনা; যৌবন যখন যায়, যায়-যায়, তখনও আবার
যৌবনেরে করেছি বন্দনা; কেননা জীবন
যৌবনেরে ভালোবাসে— প্রকৃতির রীতি এই;
যার আছে সে-ও ভালোবাসে, যার নেই সে-ও ভালোবাসে।
সন্তানের যৌবনের তাপে রোদ্দুর পোহায় পিতা,
তরুণী নাৎনির তাতে মাতামহী হাত সেঁকে নেন;
পরস্পর-বিদ্বেষী বুড়োরা
পরস্পরের মুখে আঁকা
নিজের জরার ভয়ে হাত পাতে যৌবনের দস্তের কাছেও—
আর তাই বুড়োরা এমন একা, আর তাই বার্ধক্য এমন
নিষ্ঠুর, ভীষণ।

তবে কি, জন্তুর ধর্ম মেনে নিয়ে,
প্রকৃতির অন্ধ টানে অজাত সন্তানে শুধু
ডেকেছি, কবিতা লিখে? যৌবনের বন্দনা আমার
সে কি শুধু জননশক্তির পূজা? আমার ছন্দ কি
প্রকৃতির ষড়যন্ত্রে আরেকটি যন্ত্র হ'য়ে চৈত্রের চাঁদের আর
গ্রীষ্মের চাঁপার মোহে, আর
বৃষ্টির বন্যতায়, রাত্রির অন্ধতায়, শুধু

রটিয়েছে প্রকৃতির পরামর্শ— বাড়ো বীজ, বাড়ো! বাড়ো জীব, বাড়ো!
আরো, আরো, আরো!

তা-ই যদি হ'তো, তবে আজ
পঁচিশ বছর ধ'রে কবিতা লেখার পরে, কবিতারে
ভাসায়ে দিতাম জলে, মিশায়ে মাটিতে
পাতাঝরা হাওয়ার হত্যায়। কেননা, যে-কথা
কোটি কণ্ঠে প্রকৃতি জপায় নিত্য, তারই ধ্বনি—প্রতিধ্বনি ছাড়া
আর-কিছু বলার না-থাকে যদি, তবে তো কবির
মুখ না-খোলাই ভালো।

আমি মনে করি,
যৌবনের, বিদ্রোহের, জীবনের অন্ধ আনন্দের—
কিংবা তার অস্থির স্মৃতির—যদিও করেছি স্তব
তৃপ্তিহীন, স্তাবকতা কখনো করিনি। আমার পূজায়
পৌত্তলিক কামনা ছিলো না। রূপে রঙে বানায়েছি প্রতিমারে
প্রাণে ছন্দ ছিলো ব'লে, হাতে কারুকর্মের কৌশল ;—
কিন্তু সেই রচনার আশ্চর্য সুখেও
এ-কথা ভুলিনি, যার প্রতিমারে বার-বার
বানাই, আবার ভাঙি, আবার বানাই,
সে তো নয়, কিছু নয়, আমারই আত্মার
ভালোবাসা ছাড়া,
আত্মহারা ভালোবাসা ছাড়া।

তাই বলি,
যা-কিছু লিখেছি আমি—হোক যৌবনের স্তব, অন্ধ জৈব
আনন্দের বন্দনা হোক না—
যা-কিছু লিখেছি, সব, সবই ভালোবাসার কবিতা,
কথা বুনে, ছন্দ গেঁথে, শব্দ ছেনে আমি শুধু ভালোইবেসেছি
সবচেয়ে তীব্র, মত্ত, সত্য ক'রে।

—আজও তা-ই ! আজও এই ঠাণ্ডা ঘরে ব'সে-ব'সে,
শীতে কেঁপে, হাতে হাত ঘ'ষে, অন্ধকার দিন ভ'রে মাথা খুঁড়ে-খুঁড়ে
কথা আনি, কথা বুনি, শব্দ ছানি ; কেননা তাতেই আজও
সবচেয়ে ভালোবাসি,
ভালোবাসি সবচেয়ে সত্য ক'রে।

কিন্তু কারে ? কারে ভালোবাসি ?
সে কি নারী ? সে কি কোনো নারী ? সে কি কোনো
চিরন্তনী-রঙ্গিণী নারীর মুখশ্রীর অসীম অমিয়,
অনির্বচনীয়, অবিস্মরণীয় ?
না কি সে কবিতা ? কবিতার জ্বলন্ত কল্পনা, ছন্দের দারুণ
উন্মাদনা ? বাণীর আগুন
অঙ্গে-অঙ্গে, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, রক্তের অণুতে-অণুতে ?
যদি ভাবি— ভাবিনি কখনো আগে ; আজ যদি ভাবি, মনে হয়
নারীরে, বাণীরে
এক মনে হয়। মনে হয়, আমার তনুর তন্তুতে, সীবনে
যে-কবিতা, কবিতার ভালোবাসা ছিলো, তারই শ্বেত শিখার পদ্মেরে
ফুটিয়েছি মনে-মনে নারীরে মৃণাল ক'রে : মনে হয়, নারীরে বেসেছি ভালো,
যেহেতু কবিতা
জেগেছে, জ্বলেছে তার চোখ থেকে— সে নিজে বোঝেনি।
সে নিজে বোঝেনি, আমি তাকে ভালোবেসে
আরো ভালোবেসেছি আমার ছন্দের ইন্দ্রজালে, শব্দের সম্মোহনে, আর
কবিতারে আরো বেশি ভালোবেসে আরো ভালোবেসেছি নারীরে
যতক্ষণ আমার হৃদয়ে প্রেম
কবিতা না হয়েছে, আবার
কবিতাই প্রেম।

কিন্তু এ তো পুরোনো, পুরোনো,
পৃথিবীর সকল কবির কথা ; নতুন, পুরোনো, এখন বিস্মৃত,
এখনো অশ্রুত, সব

কবির কথাই এই।...তাছাড়া, তোমার
নারীর শরীরে আর নেশা নেই, শাড়ির তরঙ্গে আর গান নেই,
চোখে-চোখে কথা নেই, হাতে-হাতে চকিত পরশে নেই কবিতার তাপ।
তবে, তবু তোমার হাতেরে—
ঠাণ্ডা ঘরে, অন্ধকার দিন ভ'রে—
ঠাণ্ডার দাঁতের ধার পার ক'রে কে আনে আবার
কবিতার
তীব্র, মত্ত তাপে,
তীব্র, মত্ত প্রতীক্ষার তাপে ?

প্রতীক্ষা কিসের ?

প্রতীক্ষা প্রেমের। কে প্রতীক্ষা করে ? যে প্রতীক্ষা করে সে-ও প্রেম।
নারীর শরীরে আর কল্পনার শিরা নেই, শিরার বন্যায় আর
কবিতার সুরা নেই ; কিন্তু প্রেম আছে, তবু আছে ; কবিতার
অথবা নারীর নয় : শুধু প্রেম।
কখনো ভাবিনি আগে— ভাবতে-যে হবে, তাও ভাবিনি, বুঝিনি—
আজ দেখি ভাবতেই হবে,
জানতেই হবে
কে আমাকে হাতে ধ'রে এত দূর এনেছে আয়ুর
শীতের সিঁড়িতে ; আবার শীতের দাঁত পার ক'রে কে আমার হাতেরে চালায়
চড়া, খাড়া, বুক-ভাঙা কবিতার চাপে।...কী তোমার নাম দেবো,
যদি-না তোমারে বলি
প্রেম ? যদি ভাবি— যত ভাবি, তত আজ এক মনে হয়
ভালোবাসা আর যারে ভালোবাসি।
মনে হয়— আর কারে নয়— ভালোবাসি ভালোবাসারেই।
যে-ভালোবাসার বাসা নতুন ননীর মতো নারীর শরীরে নয়,
ঢেউয়ের গানের মতো নামে নয়, হাজার ঢেউয়ের মতো নামে নয় ;
এমনকি, কবিতায় নয়, শব্দের ছন্দে নয়,
ছন্দের সম্মোহনে নয় :
যে-ভালোবাসার বাসা আমার হৃদয় শুধু—
তীব্র, মত্ত আমার হৃদয় ! আত্মহারা আমার হৃদয় !—

অথচ হৃদয়ে জরা ঠাণ্ডা আনে— সে-ভালোবাসার তবু শীত নেই,
অথচ হৃদয় ঝরে অন্ধকারে— সে-ভালোবাসার তবু শেষ নেই।
এই তো এখন,
এখনই আমার মন ঠাণ্ডা ঘরে, অন্ধকার দিন ভ'রে একা ব'সে-ব'সে
যেন মিশে যায় হাওয়ার হত্যায়। এই তো এখনই আমি
ফিরে যেতে চাই যেন তামসী মাতার গর্ভে, তারপর অজাত আত্মার
নিশ্চিন্ত নির্বাণে।
যে-বাসা ভেঙেই যাবে, তাকে যেন নিজ হাতে ভেঙে দিতে চাই,
হৃদয়েরে নিজেই ঝরাই পাতাঝরা হাওয়ার হত্যায়। মনে হয়,
আজই মনে হয়,
এই যেন সেই শীত, যে-শীতে আমার
বুকে আর পড়বে না কবিতার হাত, আর হাতে আর ফিরবে না
কবিতার তাপ ;
ঠাণ্ডা ঘরে, অন্ধকারে, হাতে হাত ঘ'ষে, একা ব'সে-ব'সে,
কবিতারে ভালোবেসে বলবো না আর, 'ভালোবাসি',
অন্তহীন ওষ্ঠহীন অন্ধকারে,
অণুহীন কঠিন ঠাণ্ডায়।
তাই শুয়ে পড়ি তাড়াতাড়ি, তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো কুঁকড়ে লুকোই
লেপের তাপের তলে ;
যতক্ষণ বিছানা গরম হয়, মনে হয় ঘুম যেন জীর্ণ কোনো
জন্তুর গোপন গুহা, ছোটো তার অন্ধকার রেখেছে ঠেকিয়ে
আরো বড়ো অন্ধকারে এখনো— এখনো।
আর ঘুম যখন গরম করে, মনে হয় ঘুম যেন মাতার মমতা,
তামসী-মাতার নির্জন করুণ যোনি,
পরিমিত অন্ধকারে, মমতার নরম উষ্ণতা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে
অন্তহীন অন্ধকারে, কঠিন ঠাণ্ডারে—
আরো এক দিন— আরো এক দিন।

আরো এক দিন ! আরো এক দিন !

দিন আসে আকাশে আবার, তবু অন্ধকার

দিগন্তের জন্ম-যন্ত্রণারে কণ্ঠ দেয় শালিক, চড়ুই, কাক, ওঠে ডাক,
তীক্ষ্ণ-ডাক, শঙ্খ-ডাক অন্ধকারে— 'আরো দিন! আরো এক দিন!'
মুখ-ঢাকা বুক-চাপা অন্ধকারে, লেপের গোপন, গরম গুহায়
রাত্রি কাৎরায়; আর রাত্রিরে জড়ায়ে ঘুম হাৎড়ায় স্বপ্নের শেষ;
তবু ওঠে, আরো ওঠে ডাক, ফোটে দিন, আরো এক দিন!
সেই ঘরে, অন্ধকারে আরো এক দিন!
দিন আসে আকাশে আবার, ঘরে অন্ধকার; আর সেই ঘরে, বন্ধ ঘরে,
ঘুমের নিশ্বাসে ঘন অন্ধকারে
আধো ঘুমে আধো স্বপ্নে আচ্ছন্ন আমার
মনে হয়,
নেই,
ঘুম নেই, স্বপ্ন নেই, দিন নেই,
কিছু নেই— কিছু নেই—
শুধু এই ভালোবাসা,
শুধু এই ভালোবাসা ছাড়া,
আমার উন্মত্ত, তীব্র, আত্মহারা ভালোবাসা ছাড়া!

তাই গান, তাই আজও গান।

বর্ষার দিন

সকাল থেকেই বৃষ্টির পালা শুরু,
আকাশ-হারানো আঁধার-জড়ানো দিন।
আজকেই, যেন শ্রাবণ করেছে পণ,
শোধ ক'রে দেবে বৈশাখী সব ঋণ।
রিমঝিম ঝরে অঝোরে অন্ধ ধারা,
ঘনবর্ষণে আপাত-আত্মহারা
পৃথিবীতে যেন দিন নেই, রাত নেই;
স্তম্ভিত কাল মেঘ-মায়ালোকে লীন।

পথের পাথরে উঠছে জলের ধোঁয়া,
উঁচু গাছগুলি মাথা নিচু ক'রে চুপ ;
বস্তুগলিত তরলিত এই দিনে
সেই ভালো হয়, সব যদি যায় খোওয়া।
তবু ন-টা বাজে, তবু ছাতা হাতে নিয়ে
ট্র্যামে চ'ড়ে বসি আপিশের অভিসারে,
কেরানিকীর্ণ খাঁচার রন্ধ্র দিয়ে
থেকে-থেকে লাগে সিক্ত কোমল ছোঁওয়া।

লুপ্ত, নিভৃত, অমর্ত্য এ-দিনেও
মস্ত শহর ব্যস্তমুখর কাজে,
মানুষ-মূষিক বন্দী যে-পিঞ্জরে
আজো খোলা আছে গোগ্রাসী তার হাঁ-যে।
তারই অদম্য অনতিক্রম্য টানে
অগণ্য ছাতা পথ ক'রে আছে কালো,
বিত্তশালীও মুক্ত-ইচ্ছা নয়,
কর্মঠ মুখে চলেছে মোটরযানে।

আমি সেই ভিড়ে নিঃশেষে মিশে গিয়ে
চলি একাগ্র নিরুপাধি, নামহীন।
হাড় থেকে কেউ নিংড়ে নিয়েছে মজ্জা,
পায়ে-পায়ে বাজে জীর্ণ জুতোর লজ্জা,
ব্যর্থ জীবন মূর্ত করেছে যেন
দু-দিনের দাড়ি, রজকরহিত সজ্জা।
জীবন-ডোবানো বৃষ্টি যখন ঝরে
সময়-হারানো স্বপ্ন-জড়ানো দিনে,
শ্রাবণ-তাড়ানো উগ্র-বিজলি-জ্বলা
শত নিশ্বাসে আবিল রুদ্ধ ঘরে
আজ বাঁধা পড়ে আগামী কালের ঋণে।

দিন শেষ হয় ; বৃষ্টিশেষের নেশা
নিষ্ক্রিয় মেঘে এখনো থমকি' আছে,
ক্ষণিক হলুদ-সবুজ-সোনায় মেশা
অলীক সন্ধ্যা পুন বর্ষণ যাচে।
আহা, সুন্দর এ-পৃথিবী, এ-জীবন,
বিনামূল্যেই অমূল্যতম দান,
পণ্যরাশির জঘন্য অনটন
দেহধারীটারে যত দুঃখই দিক
অতল অগমে মুক্ত আমার প্রাণ।
জীবিকা-যন্ত্র যখনি দিয়েছে ছাড়া
তখনি শ্রাবণ পরালো আমার বুকে
সোনায় শ্যামলে গাঁথা তার মালাগাছি।
কত ভাগ্য যে বেঁচে আছি, বেঁচে আছি।

ক্লান্ত, মুক্ত, বিক্ষত, উৎসুক,
ক্ষুদ্র গৃহের দুর্গে চলেছি ফিরে,
কখনো আবার পাবো না যে-দিনটিরে
তারি শেষ স্মৃতি এখনো আকাশে আঁকা।
গলিটা বিশ্রী, পিচ্ছিল, আঁকাবাঁকা,
অসতর্কেরে বেঁধে কর্কশ খোয়া,
পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ওঠে তর্কের মতো
বাদলা দিনের ভিজে কয়লার ধোঁয়া।
বিষণ্ণতার নিঃসাড়তার নেশা
আমার বুকের নিশ্বাস কেড়ে নিয়ে
বিশ্বের ছবি মুছে দেয় মন থেকে।
—ভাঙলো চমক বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে।

মৃদু ভঙ্গিতে আধেক দুয়ার ধ'রে
দাঁড়িয়ে আছে সে রঙিন শাড়িটি প'রে,

মাথার উপরে আধেক ঘোমটা টানা
আধেক ফেরানো মুখটি আড়াল ক'রে।
সব কেড়ে নিতে পারেনি দিনের ফাঁকি,
তবু আছে রাত, তবু কিছু আছে বাকি,
শূন্য মনের সুপ্তির গহ্বরে
পূর্ণতা এনে স্বপ্নের রেখাপাতে
সন্ধ্যাদীপের প্রতীক্ষা জলে যেন
একখানা ক্ষীণ, কনকরিক্ত হাতে।

মনে হ'লো তারে চিনি, তবু চিনি না যে,
বুঝি না কী-কথা কেমন ছন্দে বলি,
দরিদ্রতার লক্ষ ছিদ্র ভ'রে
অবাধ, অগাধ, বিশাল শ্রাবণ ঝরে
কদম্ববনে বিকশে অন্ধ গলি।
হৃদয়-রূপক কিছু নেই, কিছু নেই,
নেই বেলফুল, রজনীগন্ধা, জুঁই,
চুপ ক'রে শুধু চেয়ে থাকি তার মুখে,
চোখ দিয়ে শুধু কালো চোখ দুটি ছুঁই।
চিরন্তনীর অলক্ষ্য অভিসার
পার হ'য়ে এসে তুচ্ছের বঞ্চনা
বলে কানে-কানে, 'আমার অঙ্গীকার
ভুলবো না আমি, কোনোদিন ভুলবো না।

কবিমশাই…

কবিমশাই, অনেক তো ধান ভানলেন ;
বলুন এবার, বলুন দেখি সত্যি ক'রে,
ব্যাপারটা কী ? আপনি— হ্যাঁ, আপনি নিজে
দেখেছেন তো প্রেমে প'ড়ে ?

ঠিক না ? তা বলুন না সে কেমনতর ?
সোজা কথায় বুঝিয়ে বলুন ;
লোকেরা যার তাড়ায় ছোটে নানান পাড়ায়
সেইখানে কি প্রেমের আগুন ?

তা— হ'লে তো শরীরটাতেই সব মিটে যায়।
কিন্তু, দেখুন, মনও আছে ;
মুশকিলটা এই যে মনের আরজি যত
পেশ করা চাই ওরই কাছে।

যেমন ধরুন, কাউকে দেখামাত্র যদি
ঠিক চিনলেন মনের মানুষ,
কেমন ক'রে পাবেন তাকে ? কোন ফিকিরে
এক জোড়া মন, দামাল, বেহুঁশ,

মিলতে পারে ? না গো মশাই, কবুল করুন,
ছটফটানি সবই খাঁচায় ;
উড়তে হ'লে একলা যাবেন ; মিলতে হ'লে—
মিলতে হ'লে শরীরটা চাই।

কেমন মজা ; —শরীরটাকে নিংড়ে ছিঁড়ে
কিছুতেই কি ইচ্ছে পোরে !
আবার, মনের সঙ্গে মনের মোকাবিলায়
শরীর এসে জখম করে।

ভালোবাসা ? তা দেখুন না ভালো আমরা
কত কিছুই বেসে থাকি,
সোনাপিসি, কানা বেড়াল, টেবিলচেয়ার
ইত্যাদি সব টুকিটাকি

যাদের সঙ্গে স্মৃতি জড়ায়। তেমনি বিয়ে;
ঘরকন্না, সঙ্গে খাওয়া, করুণ রঙিন
পিছন-ফেলা পথের কথা চোখে-চোখে—
যৌবনের আর মেয়াদ ক-দিন।

শরীর কিংবা স্মৃতি নিয়ে আমরা আছি।
আচ্ছা এখন বলুন দেখি,
এই যত সব খুচরো নিয়ে জীবন কাটে,
তাদের সঙ্গে প্রেমের কী?

মনে করুন আপনি যখন দেখেছিলেন
একটি মেয়ের হাতের নড়া
ঝলক দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে,
তারই নাম তো প্রেমে পড়া?

তখন যে-সব পাতাল-ঠেলা উথালপাথাল
দিয়েছিলো পাগল ক'রে,
সে-উৎসাহ, সে-অশান্তি, সেই আনন্দ,
বলুন তো, তা কোথায় ধরে?

কাকের রূপে অবাক হ'য়ে তাকান যখন;
কিংবা, চৌরঙ্গি-মোড়ে
হঠাৎ কেঁপে থমকে দাঁড়ান কোনো কবির
পুরোনো লাইন মনে প'ড়ে,

এ-সংসারে সেই প্রেম কি ধরে কোথাও
আপনাদেরই মনে ছাড়া?
আর সেখানে আয়ু তো তার এক-আধ মিনিট:
না, কাটে না কারোই ফাঁড়া।

তাই তো বলি, এত যে গীত বাঁধলেন
আপনাদেরই গোপন সে-গান ;
আমরা দেখুন বেঁচে থেকেই সুখে আছি,
আমাদের আর কেন শোনান।

অসম্ভবের গান

বৃথাই জপিয়েছি তোমারে, মন,
থামাও অস্থির চ্যাচামেচি।
কোথায় অর্জুন ! কোথায় কামরূপ !
এক বসন্তেই শূন্য তূণ।

এক বসন্তেই শূন্য তূণ ?
তাহ'লে আজো কেন শান্তি নেই ?
কেন বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
পাঞ্চালীরে রাখে পাশায় পণ ?

কোনো বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
জানে না কেন এই পরিশ্রম,
জানে না সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখা
হঠাৎ কাঁপে কোন আকাঙ্ক্ষায়।

হঠাৎ কাঁপি কোন আকাঙ্ক্ষায়—
বৃথাই জপালাম তোমারে, মন—
উন্মাদিনী পাশা বরং ভালো,
আজো কি চিত্রাঙ্গদার আশা ?

বরং প্রোজ্জ্বল জুয়োর চোখে
ছাখো-না ডুব দিয়ে কোথায় তল,

কিংবা মদিরার উদার বুকে
পাবে তো অন্তত অন্ধকার।

এখানে কিছু নেই, অন্ধকার,
শূন্য তূণ এক বসন্তেই,
এ-বনে কেন তবে আবার খোঁজো
অনিশ্চয়তার অসম্ভবে।

অনিশ্চয়তার অন্বেষণে
পাঞ্চালীরে পেয়েছিলে সেবার,
সে আজ এত দূর বিখ্যাত যে
স্বয়ং কৃষ্ণের সে-ই মধুর।

ফসল অন্যের, তোমার শুধু
অন্য কোনো দূর অরণ্যের
পন্থহীনতায় স্বপ্নে কেঁপে ওঠা
কোন অসম্ভব আকাঙ্ক্ষায়।

স্বপ্নে ওঠে রোল— কোথায় কামরূপ
কাঁপছে চিত্রাঙ্গদার ঠোঁটে!
হে বীর, ভাঙো ভুল! ব্রহ্মচারী তুমি?
—আবার বসন্তের হুলুস্থুল!

আবার বসন্তের হুলুস্থুল।
ব্রহ্মচারী তুমি, সব্যসাচী?
থামে না চ্যাঁচামেচি! যদি অসম্ভব,
তবে এ-তৃষ্ণার কোথায় মূল?

শীতরাত্রির প্রার্থনা

এসো, ভুলে যাও তোমার সব ভাবনা, তোমার টাকার ভাবনা, স্বাস্থ্যের ভাবনা,
এর পর কী হবে, এর পর,
ফেলে দাও ভবিষ্যতের ভয়, আর অতীতের জন্য মনস্তাপ।
আজ পৃথিবী মুছে গেছে, তোমার সব অভ্যস্ত নির্ভর
ভাঙলো একে-একে ; —রইলো হিম নিঃসঙ্গতা, আর অন্ধকার নিস্তাপ
রাত্রি ; —এসো প্রস্তুত হও।

বাইরে বরফের রাত্রি। ডাইনি-হাওয়ার কনকনে চাবুক
গালের মাংস ছিঁড়ে নেয়, চাঁদটাকে কাগজের মতো টুকরো ক'রে
ছিটিয়ে দেয় কুয়াশার মধ্যে, উপড়ে আনে আকাশ, হিংস্রুক
হাতে ছড়িয়ে দেয় হিম ; শাদা, নরম, নাচের মতো অক্ষরে
পৃথিবীতে মৃত্যুর ছবি এঁকে যায়।

তাহ'লে ডুবলো তোমার পৃথিবী, হারিয়ে গেলো চিরদিনের অভিজ্ঞান ;
ফুল নেই, পাখি ডাকে না, নাম ধ'রে ভরা গলায় ডাকে না কেউ ;
অচেনা দেশ, অস্থায়ী ঘর, শূন্য ঘরে নিঃসম্বল প্রাণ,
আর বাইরে উত্তরের শীত, অন্ধকার, মেরু-হাওয়ার ঢেউয়ের পর ঢেউ।
এই তো সময় ; —সংহত হও।

সংহত হও, নিবিড় হও ; অতীত এখনো ফুরিয়ে যায়নি, ভুলো না,
যে-অতীত অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার জন্য, তারই নাম ভবিষ্যৎ ;
যাবে, হবে, ফিরে পাবে। মুহূর্তের পর মুহূর্তের ছলনা
কেবল চায় বেঁধে রাখতে, লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু তোমার পথ
চ'লে গেছে অনেক দূরে, দিগন্তে।

সেই প্রথম দিনে কে হাত রেখেছিলো তোমার হাতে, আজও তো
মনে পড়ে তোমার,
যাতে মনে পড়ে, ভুলতে না পারো, তাই অনেক ভুলতে হবে তোমাকে,

যাতে পথ চলতে ভয় না পাও, ফেলে দিতে হবে অনেক জঞ্জাল,
সাবধানের ভার,
হ'তে হবে রিক্ত, হারাতে হবে যা-কিছু তোমার চেনা, যাতে পথের বাঁকে-বাঁকে
পুরোনোকে চিনতে পারো, নতুন ক'রে।

এসো, আস্তে পা ফ্যালো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসো তোমার শূন্য ঘরে—
তুমি ভ'রে তুলবে, তাই শূন্যতা। তুমি আনবে উষ্ণতা, তাই শীত।
এসো, ভুলে যাও তোমার টাকার ভাবনা, বাঁচার ভাবনা, হাজার ভাবনা—
আর এর পরে
তোমার দিকে এগিয়ে আসবে ভবিষ্যৎ, পিছন থেকে ধ'রে ফেলবে অতীত।
এসো, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও আজ রাত্রে।

তা-ই চাও তুমি, তারই জন্য তোমার বুভুক্ষা ; এই মৃত্যুর হাতেই
মুহূর্তের পর মুহূর্তের ছলনা হবে ছিন্ন ;
যেমন তোমার চোখের সামনে পৃথিবী ম'রে গেলো আজ— ফুল নেই,
সব সবুজ নিবে গেছে, চারদিকে শুধু কঠিন শাদা স্তব্ধতার চিহ্ন—
তেমনি তোমাকে ডুবতে হবে, তোমাকেও।

ডুবতে হবে মৃত্যুর তিমিরে, নয়তো কেমন ক'রে বেঁচে উঠবে আবার ?
লুপ্ত হ'তে হবে পাতালে, নয়তো কেমন ক'রে ফিরে আসবে আলোয় ?
তুমি কি জানো না, বার-বার মরতে হয় মানুষকে, বার-বার,
দুলতে হয় মৃত্যু আর নবজন্মের বিরামহীন দোলায়
সত্যি যদি বাঁচতে হয় তাকে।

অন্ধকারকেই মৃত্যু নাম দিয়েছি আমরা। বীজ ম'রে যায়,
যখন অদৃশ্য হয় মাটির তলার সংগোপন গূঢ় গহ্বরে ;
শীত এলে ম'রে যায় পৃথিবী, ঝ'রে যায় পাতা, নেয় বিদায়
ঘাস, ফুল, ঘাস-ফড়িং ; নেকড়ে আসে বেরিয়ে ; কালো, কালো
নিষ্ঠুর কবরে
হারিয়ে যায় প্রাণ— ধবধবে তুষারের তলায়।

তেমনি তুমি ; —তোমারও রোদ ম'রে গেলো, ঘন হ'য়ে ঘিরলো কুয়াশা,
তোমার আলোর পৃথিবী ছেড়ে তুমি নেমে এলে পাতালে,
তোমার রঙিন সাজ ছিঁড়ে গেলো, মুছে গেলো নাম, ভুলে গেলে
তোমার ভাষা,
যত চোখ তোমাকে চিনেছিলো একদিন, সেই সব উৎসবের মতো
চোখের আড়ালে
তুমি মিলিয়ে গেলে— অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

কিন্তু মাটির বুক চিরে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে একদিন,
আবার দেখা দেয়, অন্য নামে, নতুন জন্মে, রাশি-রাশি ফসলের ঐশ্বর্যে ;
আর এই শীত— তুমি তো জানো— প্রত্যেক ফোঁটা বরফের সঙ্গে
তারও শুধু জ'মে উঠছে ঋণ ;—
সব শোধ ক'রে দিতে হবে : প্রচ্ছন্ন প্রাণ অবিচল ধৈর্যে
জেগে আছে দীর্ঘ, দীর্ঘ রাত্রি।

শুধু জেগে আছে তা-ই নয়, কাজ ক'রে যাচ্ছে গোপনে-গোপনে,
সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছে মৃত্যুর বুকে নতুন জন্ম, কবর ফেটে অবুঝ
অদ্ভুত উৎসারণ, পাথর ভেঙে স্রোত, বরফের নিথর আস্তরণে
স্পন্দন— যখন ঘোমটা ছিঁড়ে উঁকি দেবে ক্ষীণ, প্রবল, উজ্জ্বল, আশ্চর্য সবুজ
বসন্তের প্রথম চুম্বনে।

আর তাই এই মৃত্যু তোমার প্রতীক্ষা— তোমাকে তার যোগ্য হ'তে হবে,
ভুলতে হবে সাবধানের দীনতা, হাজার ভাবনার জঞ্জাল ;
সন্দেহ কোরো না, প্রতিবাদ কোরো না ; নিহিত হও এই কঠিন হিম ধবধবে
আস্তরণের অন্তঃপুরে, বীজের মতো— যেখানে অপেক্ষা ক'রে আছে
তোমার চিরকাল।
উৎসর্জন করো, সমর্পণ করো নিজেকে।

নিবিড় হ'লো রাত্রি, পাংলা চাঁদ ছিঁড়ে গেলো, নেকড়ের মতো অন্ধকার,
দলে-দলে ডাইনি বেরোলো হাওয়ায়, আততায়ীর ছুরির মতো শীত।

এরই মধ্যে তোমার যজ্ঞ ; উৎসর্গ হবে প্রাণ, আগুন জ্বালবে আত্মার,
ভস্ম হবে যাকে ভেবেছো তোমার ভবিষ্যৎ, আর যাকে জেনেছো তোমার অতীত।
পবিত্র হও, প্রতীক্ষা করো।

ঐ শোনো, ঘণ্টা বাজে গির্জেতে ; এদের উৎসবের ক্ষণ আসন্ন,
ঈশ্বরের একজাত, একমাত্র পুত্রের জন্মের স্মরণে ;—
কিন্তু তুমি— তোমার শরীর ভিন্ন মাটিতে তৈরি, অন্য
গান বাজে তোমার রক্তে, অন্য এক আশ্বাসের উচ্চারণে
ধ্বনিত তোমার ইতিহাসের আকাশ।

তুমি জেনেছো, মানুষমাত্রেই অমৃতের পুত্র— শুধু একজন নয়, প্রত্যেকে,
তুমি বলেছো, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে,
তুমি শুনেছো, জন্মের পর জন্মান্তর আবর্তের মতো এঁকে-বেঁকে
অমৃতের দিকে নিয়ে যায় ; —আর এই জীবন, সেও তার সময়ের
সীমায়, মাংসের গণ্ডিতে
বন্দী হ'য়ে থাকবে না।

তাই তো জানো তুমি— বার-বার মরতে হয় মানুষকে, নতুন ক'রে
জন্ম নেবার জন্য,
শুধু জন্ম-জন্মান্তর নয়, একই জন্মে তার এই মৃত্যু আর পুনরুত্থান,
শুধু একজনের নয়, সকল মানুষের—হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অরণ্য
লুকিয়ে রেখেছে চিরকাল এই বুভুক্ষা— তারই জন্য সব কান্না,
সব কান্না-ভরা গান,
বুকে বুক রেখে তৃপ্তিহীন প্রেমিক।

তৃপ্তিহীন বিরহে তুমি জ্বলছো— জ্বলতে দাও, পুড়ে যাক যা-কিছু
তোমার পুরোনো,
ডিমের খোলসের মতো ফেটে যাক তোমার পৃথিবী, বেরিয়ে আসুক
অন্য এক জগৎ,

এই পাতাল বেয়ে নেমে যাও আরো, আরো অন্ধকারে ; যখন সব
হারাবে, কোনো
চিহ্ন আর থাকবে না, তখনই তোমাকে ধ'রে ফেলবে অতীত, এগিয়ে আসবে
তোমার দিকে ভবিষ্যৎ—
সব নতুন— নতুন হ'য়ে।

সময় হ'লো, বাইরে অনাকার অন্ধকার, প্রেতের চীৎকারের মতো হাওয়া ;
অচেনা দেশ, অস্থায়ী ঘর, শূন্য ঘরে নিঃসম্বল প্রাণ ;
আজ আর কিছু নেই তোমার— শুধু একফোঁটা রক্তে-লীন সংগোপন
ঝাপসা পথ-চাওয়া
এই ব্যাপ্ত কুয়াশার মধ্যে ক্ষীণ, ক্ষণিক, লুকিয়ে-থাকা তারার মতো
কম্পমান।
প্রস্তুত হও, প্রতীক্ষা করো তোমার মৃত্যুর জন্য।

যে-মৃত্যুকে ভেদ ক'রে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে নির্ভুল,
রাশি-রাশি শস্যের উৎসাহে, ফসলের আশ্চর্য সফলতায়,
যে-মৃত্যুকে দীর্ণ ক'রে বরফের কবর ফেটে ফুল
জ্ব'লে ওঠে সবুজের উল্লাসে, বসন্তের অমর ক্ষমতায়—
সেই মৃত্যুর— নবজন্মের প্রতীক্ষা করো।

মৃত্যুর নাম অন্ধকার ; কিন্তু মাতৃগর্ভ— তাও অন্ধকার, ভুলো না,
তাই কাল অবগুণ্ঠিত, যা হ'য়ে উঠছে তা-ই প্রচ্ছন্ন ;
এসো, শান্ত হও ; এই হিম রাত্রে, যখন বাইরে-ভিতরে কোথাও
আলো নেই,
তোমার শূন্যতার অজ্ঞাত গহ্বর থেকে নবজন্মের জন্য
প্রার্থনা করো, প্রতীক্ষা করো, প্রস্তুত হও।

রাত্রি

রাত্রি, প্রেয়সী আমার, প্রসন্ন হও, নিদ্রা দিয়ো না।

তোমার মনে আছে, রাত্রি, আমাদের মিলনের অনুষ্ঠান? সেই নগ্নতার শপথ, স্তব্ধতার শপথ, যৌতুকের বিনিময়?

তুমি আমাকে দিয়েছিলে তোমার চাঁদ, অনেক চাঁদ, আরো অনেক তারা, তারা-ভরা আকাশ, জ্বলন্ত, আগুনের নিশ্বাস-ফেলা অন্ধকার। আর বিশাল দেশ, মহাদেশ, জনতাময় নির্জনতা, আর অনিদ্রার তীব্রমধুর উন্মাদনা।

আর আমি তোমাকে দিয়েছিলাম আমার প্রেম, আমার প্রাণ, আমার আত্মার নির্যাস, সত্তার সৌরভ।

দিন, তোমার বোন, তোমার সতিন, সে তার কাঁকন-পরা মোটা হাতে বাধ্য করেছে আমাকে, নিয়ে গেছে টেনে তার অলিতে-গলিতে, আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা বাজিয়ে-বাজিয়ে। ব্যস্ত সে, অঢেল রৌদ্র নিয়েও অস্পষ্ট; এলোমেলো, ছেঁড়াখোঁড়া, আকৃতিহীন। তার মুহূর্তগুলি সীসের মতো বোবা শব্দে ফুটপাতে খ'সে পড়ে, তার ঘণ্টার টুকরোগুলোকে জোড়া দিয়ে আর-কিছুই পাওয়া যায় না— শুধু খিদে পাওয়ার দীনতা, খেতে পাওয়ার হীনতা, শুধু ইতর সুখ, বামন দুঃখ।

এই দিন আমি মেনে নিয়েছি, সহ্য করেছি, বকলশ-আঁটা কুকুরের মতো ঘুরেছি তার পিছনে— তোমার জন্য, তোমারই জন্য, রাত্রি! আ, সেই মুহূর্ত, যখন দিনের মুঠো শিথিল, রাবণ ভিড় নিবৃত্ত, আমি আবার খুঁজে পেয়েছি তোমাকে, নগ্ন হ'য়ে, শুদ্ধ হ'য়ে, তোমার কালো চুলের অতল নীল তরঙ্গে-তরঙ্গে স্নান ক'রে বলতে পেরেছি— 'আমি আছি!'

তুমি আমাকে দিয়েছো তোমার চাঁদ, অনেক চাঁদ— ম'রে যাওয়া, ফিরে-আসা চাঁদ, আর (নক্ষত্রের নিশ্বাস ফেলা অন্ধকার।) আর আমি তোমাকে দিয়েছি আমার প্রাণ, আমার মন, আমার চেতন সত্তা নিংড়ে-নিংড়ে পূর্ণ করেছি চুম্বনের পাত্র।

মনে আছে?

আমি খেলা করেছি তোমার চাঁদ নিয়ে, যেমন শুয়ে-শুয়ে কানের দুলের মুক্তো গোনে প্রেমিক, তোমার বাঁকা চাঁদ, রোগা, ঝোলা, চ্যাপ্টা চাঁদ, শাদা, সবুজ, হলদে, উর্বশীর রূপের মতো নির্লজ্জ, ভাঙা কাচের দাঁতের মতো শীতের

চাঁদ, ঈশ্বরের ক্ষমার মতো দিগন্তে। দুই হাতে ছেনেছি তোমার অন্ধকার, উঠেছি তার ধাপে-ধাপে বেয়ে, নেমেছি তার আনন্দময় ঢালু দিয়ে গড়িয়ে, তার নরম, রোমশ, অফুরন্ত ভাঁজে-ভাঁজে জড়িয়ে গিয়েছি, তোমার বিশাল, তরল আলিঙ্গনে লীন হ'তে-হ'তে বুঝেছি যে নক্ষত্রেরা আর-কিছু নয়, তামসীর চিন্ময় রূপ— যখনই তুমি চিন্তা করো, তখনই আকাশে তারা ফোটে, মনস্বিনী।

আর আমিও চেয়েছি আমার চিন্তা আলো হ'য়ে ফুটুক, তারা হ'য়ে জ্বলুক, শাদা, সবুজ, সোনালি তারা, বরফের চোখের মতো ধারালো, দেবতার অশ্রুর মতো দিগন্তে। আর, তোমার সেই পূর্ণতার প্রহরে, যখন কবি, দুঃখী, চোর ছাড়া আর-কেউ জেগে থাকে না, আমার আশার অশ্ববেগ আমাকেই মাড়িয়ে গেছে খুরের তলায়, তখন তোমার ফুলে-ফুলে ওঠা বুকের মধ্যে থরথর ক'রে কেঁপেছি আমি, বলেছি তোমার কানে-কানে আমার আকুল দুঃখ, পাগল বাসনা, বাসনার ব্যর্থতা— তোমারই কানে-কানে, প্রিয়তমা!

তুমি আমাকে সান্ত্বনা দাওনি— হীন সান্ত্বনা দাওনি; শুধু তোমার গুঞ্জনময় স্তব্ধতার স্বরে বলেছো, 'এই নাও, এই বিশাল দেশ, বিশাল নির্জন, একে জনতাকীর্ণ ক'রে তোলো তোমার রক্ত দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে!'

আমার বাসনা, আমার পরাজয়, আমার দুঃখের ঐশ্বর্য, তার বদলে এই তুমি দিয়েছো আমাকে— এই সবীজ দেশ, নির্জন দেশ, আর অনিদ্রার উন্মাদনা।

সব ভুলে গেছো?

না, না, আমি জানি তোমাকে, ছলনাময়ী, তুমি অসতী হ'য়ে জাগিয়ে দিলে আমার পৌরুষ, আমাকে পরিত্যাগ ক'রে জ্বালিয়ে দিলে তৃষ্ণা। একদিন তুমি নিজেই ধরা দিয়েছিলে আমাকে, আজ তোমার এই পণ যে আমি তোমাকে জয় করবো, রাক্ষসী মৃত্যুকে মেরে জয় ক'রে নেবো তোমাকে, অজরা। আর যেহেতু আমার কথা ছাড়া অস্ত্র নেই, গান ছাড়া সৈন্য নেই, তাই কথার ইস্পাতে শান দিয়ে-দিয়ে এই গান আজ বানালাম— ফিরে এসো, রাত্রি, নেমে এসো এই মৃত্যুর উপর, আনো তোমার বুক ভ'রে আমার যন্ত্রণা— স্বপ্ন দাও, দুঃস্বপ্ন দাও, দাও ঈশ্বরের মতো কবির নিঃসঙ্গতা, কিংবা জ্বরের প্রলাপের আনন্দ— তোমার চিরযৌবনের যে-কোনো একটি চিহ্ন দাও আমাকে— শুধু নিদ্রা দিয়ো না, নিদ্রা দিয়ো না। আমাকে বাঁচতে দাও তোমার মধ্যে, তোমার নীল, কুটিল শিরায়-শিরায় আমি যেন ছড়িয়ে যাই আকাশ ভ'রে, তোমার চাঁদের

ভাঙা-গড়ার স্পর্শ নিয়ে রঙিন হ'য়ে উঠি, স্পন্দিত হই নক্ষত্রের নিশ্বাসে ;— আর যখন, আমাদের প্রণয়ের তাপ সইতে না-পেরে, হিংসুক দিন দিগন্তকে ডিমের মতো ফাটিয়ে দেয়, তখন তোমার বুজে-আসা চোখের— তোমারই রহস্যের অপরিমাণ উজ্জ্বল ভারে বুজে-আসা চোখের— সর্বশেষ পলকপাতে আমি যেন চিরন্তনকে পান করতে পারি— এক মুহূর্তে, নিঃশেষে।

সমর্পণ

নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে,
জোয়ার এলো জলে ;
লুকিয়ে-রাখা আশার মতো
বাঁশের ফাঁকে ইতস্তত
একটি-দুটি ম্লান জোনাক
কচিৎ নেবে, জলে।
আকাশ ভরা মেঘের ভারে
বিদ্যুতের ব্যথা
গুমরে উঠে জানায় শুধু
অবোধ আকুলতা।
আকারহীন, হিংস্র, খল,
অনিশ্চিত ফেনিল জল
মিলিয়ে গেলো অদৃষ্টের
মৌন ইশারাতে ;—
তোমায় আমি রেখে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।

তাকিয়ে-থাকা একটি দীপ
জলছে ছোটো ঘরে,
একটি হাত এলিয়ে আছে
কম্পমান বুকের কাছে

ছিন্ন-স্মৃতি-শেলাই-করা
শীতল কাঁথার 'পরে।
মনে পড়ার ইন্দ্রজালে
ঝাপসা হ'লো দ্বার,
আমার হাতে লাফিয়ে ওঠে
তীক্ষ্ণ তলোয়ার।
সুদূর কালে হারিয়ে-যাওয়া
দেশান্তরী উঠলো হাওয়া ;—
ছেলেবেলার গন্ধভরা
অন্ধকার রাতে
আমার প্রেম রেখে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।

পালের ভাঁজে ভবিষ্যের
গর্ভ ওঠে ফুলে,
অনাগতের রুদ্ধ চাপে
পাটাতনের পাঁজর কাঁপে,
ত্রস্ত মাছের অস্থিরতায়
গলুই ওঠে দুলে।
কঠিন হাতে নাবিক ধরে
আকাঙ্ক্ষার হাল,
কপট স্রোতে ভাসে আমার
মৃতদেহের ছাল।
হৃদয়-তলে দাঁড়ের টানে
অমর নাম প্রলয় আনে
ঢেউয়ের আর দিগন্তের
মাতাল সংঘাতে ;-
আমার প্রাণ রেখে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।

উল্টো দিকে ছুটলো আমার
আঁধার আরাধনা ;
অসীম নীল ঘুমের 'পরে
যন্ত্রণায় জড়িয়ে ধরে
মুক্তিহীন জাগরণের
মূর্খ প্রতারণা।
তবুও আছে একটি ঘর
কুঞ্জলতায় ঘেরা,
দাওয়ায় ব'সে জটলা করে
পূর্বপুরুষেরা !
তাঁদের মৃদু কানাকানি
পড়ুক ঝ'রে সাবধানী
হাজার ভয়, সংশয়ের
অন্ধ অজানাতে ;—
আমি তোমায় রেখে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।

স্মৃতির প্রতি : ১

তোমাকেই দেবী ব'লে মানি। কিছু নেই, যা তোমার নয়।
তা-ই তো তোমার ঘুম, যাকে বলি আরম্ভ, কারণ ;
চলে সে গোপনে, তার দিগন্তেও নেই জাগরণ ;
কিন্তু যদি আধেক তাকিয়ে তুমি পাশ ফেরো, ফুটে ওঠে ফুলের বিস্ময়,

পৃথিবীর মাটিরে মদির ক'রে চুমো খায় উজ্জ্বল আঙুর।
তাই পট শূন্য প'ড়ে থাকে, পাথর নিঃসাড়, বীণা
শুধু বিসংবাদী, যতক্ষণ, তটের উদ্বেল ঢেউ পেরিয়ে, তুমি না
শেখাও সাগর-যাত্রা, যুযুধান রাত্রি আর দিনের বন্ধুর

পথ পিছে ফেলে, নিয়ে যাও ত্রিকালের শান্ত সমতলে,
দূর থেকে আরো দূরে, জন্মান্তরে, প্রাগৈতিহাসিক
নীলিমায়— যেখানে, মাতার গর্ভে, নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলে

মানবের ভাগ্য আর অফুরান ঐশ্বর্য তোমার।
আঁধার তোমার স্বত্ব, কিন্তু তা-ই আলোর অধিক;
তুমি যা অলস হাতে ফেলে দাও, কানাকড়ি মূল্য নেই তার।

স্মৃতির প্রতি : ৩

আমাদের পরিবর্তনের
অর্থ : এই দেহ ম্রিয়মাণ;
দ্যুতিময় জন্তুর উত্থান
তাও শুধু পিতৃহননের

নান্দীপাঠে ফাল্গুন ফুরায়।
কৈশোরের মঞ্জুল মুখোশ
ঢেকে রাখে জরার আক্রোশ;
প্রগতির দৃপ্ত পাহারায়

অবিরাম চলে অধঃপাত।
বাঁচে শুধু, যা তোমার হাত
চিরকাল মূর্ছার কন্দরে

রেখে দিয়ে, করে উন্মোচন—
রূপান্তর থেকে রূপান্তরে—
পৃথিবীর প্রথম যৌবন।

দায়িত্বের ভার

কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর।
লেখা, পড়া, প্রুফ পড়া, চিঠি লেখা, কথোপকথন,
যা-কিছু ভুলিয়ে রাখে, আপাতত, প্রত্যহের ভার—
সব যেন, বৃহদরণ্যের মতো তর্কপরায়ণ
হ'য়ে আছে বিকল্পকুটিল এক চতুর পাহাড়।
সেই যুদ্ধে বার-বার হেরে গিয়ে, ম'রে গিয়ে, মন
যখন বলেছে, শুধু দেহ নিয়ে বেঁচে থাকা তার
সবচেয়ে নির্বাচিত, প্রার্থনীয়, কেননা তা ছাড়া আর
কিছু নেই শান্ত, স্নিগ্ধ, অবিচল প্রীতিপরায়ণ—
আমি তাকে তখন বিশ্বস্ত ভেবে, কোনো-এক দীপ্ত প্রেমিকার
আলিঙ্গনে সত্তার সারাৎসার ক'রে সমর্পণ—
দেখেছি দাঁড়িয়ে দূরে, যদিও সে উদার উদ্ধার
লুপ্ত ক'রে দিলো ভাবা, লেখা, পড়া, কথোপকথন,
তবু প্রেম, প্রেমিকেরে ঈর্ষা ক'রে, নিয়ে এলো ক্রূর বরপণ—
দুরূহ, নূতনতর, ক্ষমাহীন দায়িত্বের ভার।
কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর

কোনো কুকুরের প্রতি

আমাকে দিয়ো না দৃষ্টি। বিচ্ছেদে ভ'রে আছে মন।
যত গাঁথি মালা, তত স'রে যায় দূর আর কাছে।
বহুদিন-প্রতিশ্রুত আজ আর কালের চুম্বন
অবশেষে ঠেকে যায় স্বচ্ছ এক ক্ষমাহীন কাচে।

বরং, কখনো যারা কাগজের নৌকোয় চ'ড়ে
দেয়নি সাগর-পাড়ি, বেছে নাও তাদেরই কাউকে ;
পাবে বাড়ি, মাংস-ভাত ; গন্ধের অন্ধকারে ঢুকে
ঘুমোবে, দুপুরবেলা, মেয়েদের হাতের আদরে।

যাবে না ? তবে কি ভাবো সমানুকম্পনে
উঠবো হঠাৎ বেজে আমি এক অদ্ভুত বাঁশরি,
এঁকে দেবো তোমার হরিণ-চোখে স্মরণের ছবি ?

…কেবল অর্ধেক ঠিক। জানি আমি, স্বর্গের অপ্সরী
তুমি, শাপভ্রষ্ট। কিন্তু সেই শাপের মোচনে
আমার আসেনি ডাক। এখনও যথেষ্ট নই কবি।

রবীন্দ্রনাথ

ছিলে না বনের মৃগ, ঘাস, ফুল মেঘের গহ্বরে
রঙিন আলোর খেলা। এমনকি, বালক ছিলে না।
তীক্ষ্ণ চোখ ঘিরে ছিলো সারাদিন। হাতের খেলেনা
ভারি হ'য়ে প'ড়ে গেছে হাত থেকে। তবু ছিলে অবসরে ভ'রে

তুমিও পাওনি দেখা নাপোলিতে নীলনয়নার।
চিঠির উত্তর নেই। দেহ ছিলো, আমাদেরই মতো।
হয়তো ঘামাচি, মশা। প্রতিকূল বাতাসে প্রহৃত
ভূলুণ্ঠিত ঘুড়ির আঁধার ঘণ্টা। তবু ছিলে প্রতিযোগিতার

পরপারে, বিশ্রামে শুভ্রতাময়, যেন তুমি কখনো করোনি
চেষ্টা, কিংবা যেন কলস গিয়েছে ভেসে, তুমি শুধু জল।
যা পেয়েছি দু-দণ্ড তোমার কাছে, নিঃশব্দে, কেবল

সন্ধ্যার নিবিড়তায় ব'সে থেকে, আজ তাকে নিঘুর্ম যামিনী
জ্বেলে দেয় কূট গ্রন্থে, ভাবনার পাণ্ডুর অনলে,
বাক্, অর্থ, সম্পর্কের হিংসুক দাঙ্গা শেষ হ'লে।

রাত তিনটের সনেট : ১

শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত। গভীর সন্ধ্যায়
নরম, আচ্ছন্ন আলো ; হলদে-ম্লান বইয়ের পাতার
লুকোনো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার ;
অথবা অত্বর চিঠি, মধ্যরাতে লাজুক তন্দ্রায়

দূরের বন্ধুকে লেখা। যীশু কি পরোপকারী
ছিলেন, তোমরা ভাবো ? না কি বুদ্ধ কোনো সমিতির
মাননীয়, বাচাল, পরিশ্রমী, অশীতির
মোহগ্রস্ত সভাপতি ? উদ্ধারের স্বত্বাধিকারী

ব্যতিব্যস্ত পাণ্ডাদের জগঝম্প, চামর, পাহারা
এড়িয়ে আছেন তাঁরা উদাসীন, শান্ত, ছন্নছাড়া।
তাই বলি, জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে ;

হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির।
যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর,
আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে।

আটচল্লিশের শীতের জন্য : ১

না, তুই নিবি না আর। শূন্য ছেনে হৃদয় ভরাবি।
হাঁ খোলে পাতালবেশ্যা, নেমে আসে কুমারী নীলিমা
সেখানে ফোটে না ফুল, ম'রে যায় কীটের কালিমা।
যা বলে বলুক ঋতু, তুই শুধু পার হ'য়ে যাবি।

—'কিন্তু কোনখানে?' হায়, সনাতন, শীর্ণ কৌতূহল!
বোঝে না, অনবরত অবসানে আরম্ভ গতির,
স্নান, যান, ধানখেতে কিছু এসে যায় না নদীর,
সাগর করে না প্রশ্ন— 'কোন বার্তা নিয়ে এলি' বল!'

ভুলে যা ঝংকার, ঝর্না, বরদাত্রী কঙ্কাবতীরে,
যার ঠোঁট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে স্বরলিপি শিখেছিলি তুই;—
ওরে সেই বরফ-গলানো রঙ্গ আর যদি না থাকে কিছুই,

তবু ত্যাখ, প্রবল প্রেতের মতো দলে-দলে নামে দুই তীরে
অতীত, আসন্ন কাল; সেতু বাঁধে শ্রমিক সম্প্রতি—
যার কূট কুয়াশায় কেলি করে ঋষি আর ধীবরযুবতী।

এক তরুণ কবিকে

পাঞ্জাবিতে ইস্ত্রি রেখো কড়া,
ছাঁটা চুলে যত্নে এঁকো টেরি;
লোকে দেখে ভাবুক, 'আমাদেরই!'
নয়তো ঝড়ে ছিঁড়বে দড়িদড়া।

সামনে তোমার অনেক আছে ফাঁড়া:
আক্রমণ, কাফে-র করতালি,
অবসাদের মলিন জোড়াতালি।—
চতুর মন, ছদ্মবেশ ছাড়া

ঢাল-তলোয়ার আর কী তোমার আছে,
যত্নে যার বানের জলেও বাঁচে
ভ্রূণের মতো, অকথ্য সেই আগুন?

আর তাছাড়া, সত্যি যদি উনুন
রাঙিয়ে তোলে নিশ্বাসের হাওয়া—
আর কেন বা বিজ্ঞাপনের ধোঁয়া!

গ্যেটের অষ্টম প্রণয়

বর্তমানে কাব্যে আমি রাজা,
গদ্য লেখায় আমার নেই জুড়ি।
কুঞ্জবনে মরণ রটে তাজা,
কিন্তু আরেক রক্তরঙা কুঁড়ি

দুলিয়ে দেয় স্বনিত স্বপ্নেরা
হিমের ক্ষীণ বৃন্তে টলোমলো।—
দেশান্তরে, লবণ-জলে ঘেরা,
গোলাপ, তুমি কোন বাগানে জ্বলো?

কোন দ্রাঘিমায় উদ্ভাসিত নীলে
বাঘের মতো নিদাঘে ডাক দিলে,
তুলতে কি চায় তারই প্রতিধ্বনি

পাতার লালে মাতাল নিঃস্বেরা!
আকাশ ভেঙে আগুন ফোটে উষার,
ছদ্মবেশে ব্যর্থ করে তুষার।

—হাতেম, হায়, কবির শিরোমণি,
গদ্য লেখায় সবার চেয়ে সেরা!

অনুবাদ

শার্ল বোদলেয়ার

চুল

অনেক, অনেকক্ষণ ধ'রে তোমার চুলের গন্ধ
টেনে নিতে দাও আমার নিশ্বাসের সঙ্গে ;
আমার সমস্ত মুখ ডুবিয়ে রাখতে দাও তার গভীরতায়
ঝরনার জলে তৃষ্ণার্তের মতো ;
সুগন্ধি রুমালের মতো তা নাড়তে দাও হাত দিয়ে
যাতে স্মৃতিগুলো ঝ'রে পড়ে হাওয়ায়।

তুমি যদি জানতে যা-কিছু আমি দেখি ! যা-কিছু আমি শুনি !
যা-কিছু আমি অনুভব করি তোমার চুলের মধ্যে !
আমার আত্মা উড়ে চলে তার সৌগন্ধ্যে
যেমন অন্যদের, সংগীতের পাখায়।

তোমার চুলে সম্পূর্ণ একটি স্বপ্ন বিজড়িত,
সেখানে পালের আর মাস্তলের ভিড় ;
তার মধ্যে অনেক বিশাল সমুদ্র, যাদের উপর দিয়ে
মৌশুম আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় মোহময় দেশে
আকাশ যেখানে আরো নীল,
আরো গভীর,
যেখানে বায়ুমণ্ডল ফলে-ফলে সুরভি,
আর পাতায়, আর মনুষ্যচর্মে।

তোমার চুলের মহাসমুদ্রে আমি দেখছি
বিষণ্ণ গানে-গানে গুঞ্জিত এক বন্দর,
সেখানে সমস্ত জাতির বলশালী মানুষ,
আর সমস্ত রকম আকারের জাহাজ
তাদের সূক্ষ্ম, জটিল স্থাপত্য খোদাই করছে বিশাল আকাশে—
চিরন্তন উত্তাপের সেই ধাত্রী।

উত্তম শব, আকাশ দেখছে দৃষ্টি মেলে,
ফুটলো ফুলের মতো,
এমন তীব্র গন্ধ, ভেবেছো হঠাৎ ট'লে
ঘাসে প'ড়ে যাবে না তো ?

ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি প'চে-ওঠা, গলা জঠর ছেয়ে ;
আর নামে, অবিরল,
ঘন, কালো স্রোতে সপ্রাণ, ছেঁড়া টুকরো বেয়ে
কৃমির সৈন্যদল।

আর এই সব ওঠে আর পড়ে ঢেউয়ের মতো,
কাঁপে আচমকা স্বননে ;
যেন সে-শরীর, শিথিল বায়ুতে নিশ্বসিত,
জীবিত পুনর্জনমে।

সে এক জগৎ, অদ্ভুত স্বর ঝরে তা থেকে,
যেন জল গতিমন্ত,
কিংবা বাতাস, কিংবা কুলোয় ঘুরিয়ে ঝেঁকে
শস্য বাছার ছন্দ।

যত আছে রূপ, স্বপ্নে সকলই বিলীয়মান ;
আর, বিস্মৃত পটে,
শিল্পীর কৃতি, বিকল্পহীন স্মৃতির দান,
ধীরে রেখা ওঠে ফুটে।

দূরে, অস্থির কুক্কুরী এক, রুষ্ট চোখে
আমাদের করে লক্ষ্য,
কখন ফিরিয়ে নেবে কঙ্কালপিণ্ড থেকে
তার খণ্ডিত ভক্ষ্য।

—আর তবু তুমি, তুমিও হবে এ-বিষ্ঠাধারা,
জঘন্য কীটপংক্তি,
আমার স্বভাবী সূর্য, আমার চোখের তারা,
দেবদূত, সংরক্তি!

তা-ই হবে তুমি, অন্ত্য কৃত্য সাঙ্গ হ'লে,
ওগো লাবণ্যপ্রতিমা,
যবে, অস্থির আধারে, নশ্বর ফুলের তলে
বিনষ্ট হবে তনিমা।

তাহ'লে, রূপসী, বোলো সে-কৃমির বংশে, যার
চুম্বন করে গ্রাস,
আমি বাঁচিয়েছি ধ্বস্ত প্রেমের আকৃতি, আর
স্বর্গীয় নির্যাস।

সুন্দর জাহাজ

অলস মায়াবিনী, বলবো তোরে, শোন,
অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ।
আঁকবো অপরূপ মাধুরী—
বালিকা-মহিলার মিলন-মোহানার চাতুরী।

যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান,
তখন মানি তোরে সুতনু তরণীর সাগর-অভিযান।
তেমনি চঞ্চল, উত্তাল,
শিথিল, মন্থর ছন্দে হেলে-দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল।

দৃপ্ত গ্রীবা তোর, নধর স্কন্ধের আয়োজন
দেখায় মাথাটির কত যে অদ্ভুত বিকিরণ ;
সৌম্য বিজয়ের নির্যাস
ছড়িয়ে, ওরে শিশু-রাজ্ঞী ! তোর পথে হেলায় চ'লে যাস।

অলস মায়াবিনী, বলবো তোরে, শোন,
অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ।
আঁকবো অপরূপ মাধুরী—
বালিকা-মহিলার মিলন-মোহানার চাতুরী।

এগিয়ে আসে তোর নিটোল স্তনভার রেশমে অবিরাম,
অনেক দ্বৈরথে বিজয়ী ওরা দুটি বর্ম অভিরাম—
যুগল ঢাল ধরে কত না
সুগোল, রেখায়িত আলোক-রশ্মির দ্যোতনা।

উগ্র ঢাল, তার তীক্ষ্ণ শরমুখ রঙিন, কোপনীয়,
রেখেছে সঞ্চিত যা-কিছু মায়াময়, মধুর, গোপনীয়—
আসব, সুরা, সৌগন্ধ্য—
বুদ্ধি বানচাল, হৃদয়ে প্রলাপের ছন্দ।

যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান,
তখন মানি তোরে সুতনু তরণীর সাগর-অভিযান।
তেমনি চঞ্চল, উত্তাল,
শিথিল, মন্থর ছন্দে হেলে-দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল।

মহান জঙ্ঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন।
যেন রে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর খলে নাড়ে কালিমা-ঘন এক পাঁচনে।

প্রবল নায়কের বিরোধী খেলোয়াড় অকাতর,
ও-দুটি বাহু যেন কান্তিঝলকিত অজগর ;
প্রেমিক বাঁধা পড়ে, ক্ষমাহীন
অতি কঠিন তোর হৃদয়-কারাগারে, চিরদিন।

দৃপ্ত গ্রীবা তোর, নধর স্কন্ধের আয়োজন
দেখায় মাথাটির কত যে অদ্ভুত বিকিরণ ;
সৌম্য বিজয়ের নির্যাস
ছড়িয়ে, ওরে শিশু-রাজ্ঞী ! তোর পথে হেলায় চ'লে যাস।

বিতৃষ্ণা ৩

আমি যেন রাজা, যার সারা দেশ বৃষ্টিতে মলিন,
ধনবান, নষ্টশক্তি, যুবা, তবু অতীব প্রবীণ,
শিক্ষকের নমস্কার প্রত্যহ যে দূরে ঠেলে রেখে,
শিকারি কুকুর নিয়ে ক্লান্ত করে নিজেই নিজেকে।
কিছুই দেয় না সুখ— না মৃগয়া, না শ্যেনচালন,
না তার অলিন্দতলে মৃতপ্রায় তারই প্রজাগণ।
মনঃপূত বিদূষক প্রহসনে যত গান গাঁথে,
আনত ললাট থেকে রোগচিহ্ন পারে না সরাতে ;
ফুলচিহ্নে আঁকা তার শয্যা, তাও নেয় রূপান্তর
কবরে, এবং যার সাধনায় রাজারা সুন্দর,
জানে না সে-মেয়েরাও, লজ্জাহীন কোন প্রসাধনে
আমোদ ফোটানো যায় এ-তরুণ কঙ্কালের মনে।
করেন কাঞ্চনসৃষ্টি, সে-মুনির মেলেনি সন্ধান
কোন বিষময় দ্রব্যে অহোরাত্রি নষ্ট তার প্রাণ।
এমনকি রক্তস্নান, লিপ্ত যাতে সব ইতিহাস,
পুরাতনী রোমকের, অর্বাচীন দস্যুর বিলাস,
তাও এই মূঢ় শবে তাপলেশ পারে না জোগাতে,
লিথির সবুজ স্রোত— রক্ত নয়— বহে যে-শিরাতে।

সান্ধ্য প্রদোষ

সন্ধ্যা আসে, মোহিনী সুন্দরী সন্ধ্যা ; দুষ্ক্রিয় দুর্জনে
সখ্য দেয় ; আসে যেন ষড়যন্ত্রী, তরক্ষুচরণে ;
বিশাল পর্দার মতো আকাশ ক্রমশ বোজে, আর
অধৈর্য মানুষ নেয় পশুত্বের বন্য অঙ্গীকার।

হে সন্ধ্যা, মধুর সন্ধ্যা, তুমি তারই ঈপ্সিত প্রহর
হাতে যার আজিকার দিনব্যাপী শ্রমের স্বাক্ষর
সত্যই অঙ্কিত! —তুমি সেই সব আত্মার সান্ত্বনা,
দুরন্ত দুঃখের তাপে দগ্ধ যারা ; যে-অনন্যমনা
পণ্ডিতের নতশির এতক্ষণে ভারাক্রান্ত হয়,
যে-শ্রমিক ন্যুব্জপৃষ্ঠে ফিরে পায় শয্যার আশ্রয়।

ইতিমধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত পিশাচের দঙ্গল, সহসা
গুরুভারে জেগে উঠে, শুরু করে দৈনিক ব্যবসা।
খড়খড়ি কাঁপায় তারা, পর্দা ছেঁড়ে, দরোজা ধাক্কায় ;
বাতাঘাতে উৎপীড়িত আলোকের অস্থির ছায়ায়
রঙিন গণিকাবৃত্তি প্রজ্বলিত হ'লো ইতস্তত
পথে-পথে, অবাধ পুরীষস্রাবী বল্মীকের মতো ;
খোলে সে নিগূঢ় গলি দিকে-দিকে ; চতুর সংকেতে
আকস্মিক অতর্কিত আক্রমণে শত্রু যেন জেতে ;
ক্লেদের নগর এই— তার বুকে চলে এঁকে-বেঁকে,
যেমন শঙ্কিত কৃমি মানুষের চক্ষু থেকে ঢাকে
খাদ্য তার। এদিকে ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দে জাগে রান্নাঘর
এখানে-ওখানে ; অর্কেস্ট্রা উল্লসে ; ওঠে তারস্বর
রঙ্গমঞ্চে ; আর শস্তা রেস্তোরাঁয়, যেখানে জুয়োর
ফুর্তির উৎসাহ জমে, জোটে বেশ্যা, মাতাল, জোচ্চোর,
তাদের সাকরেদ যত ; জোটে চোর, পিশুনস্বভাবে
প্রতিশ্রুত ; অবিলম্বে সেও যাবে, সেও কাজে যাবে,

মৃদু হাতে দরজা খুলে, বাক্স ভেঙে, হয়তো কুড়াবে
দু-দিনের অন্ন তার, কিংবা উপপত্নীরে সাজাবে।

মগ্ন হও, এ-গম্ভীর লগ্নে তুমি মগ্ন হও, মন,
ভাবনায় ; রুদ্ধ করো কর্ণদ্বার ; এই সেই ক্ষণ,
যখন রোগীর দুঃখ তীক্ষ্ণ হয় ; অন্ধ কালো রাত
আঁকড়ে তাদের কণ্ঠ ; সন্নিকট তাদের নিপাত,
নিয়তির পূর্ণতায়, সর্বগ্রাসী সামান্য পাতালে ;
ওঠে ব্যাপ্ত দীর্ঘশ্বাস, ঘন হ'য়ে নামে হাসপাতালে।
এর মধ্যে একাধিক, ব্যঞ্জনের সৌরভের আশে
ফিরবে না আপন ঘরে, রাত্রিকালে, দোসরের পাশে

উপরন্তু অনেকেই বোঝেনি, জানেনি কোনোদিনই
গৃহকোণে মধুময় শান্তি ; এরা কখনো বাঁচেনি '

কোনো মালাবারের মেয়েকে

তোমারই হাতের মতো সুকুমার তোমার পা দুটি ;
সুন্দরী শ্বেতার চোখে গুরুতর ঈর্ষার ভ্রূকুটি
জাগাও জঘন-ভঙ্গে ; শিল্পীর আদরে গড়া মধুর শরীর—
তারও চেয়ে তোমার মখমল-চোখ আরো কালো— বিশাল, গভীর।
সেই নীল আতপ্ত হাওয়ার দেশে, যেখানে বিধাতা
তোমাকে দিলেন জন্ম— কৌটো ভ'রে লঙ্কা, জিরে, তেজপাতা
তুলে রাখো, কুঁজোয় ঠাণ্ডা জল, আয়েসি ভর্তার
কল্কিতে তামাক সাজো, ঠেকাও মশার হল্লা শয্যা থেকে, আর
যখন ভোরের গান ঝাউবনে ওঠে কেঁপে-কেঁপে
কিনে আনো সদ্য বাজার থেকে আনারস, পেঁপে।
সারাদিন স্বাধীন বেড়াও তুমি, খোলা পায়ে যেখানে-সেখানে,
গুনগুন করো কোন অচেনা, পুরোনো সুর বাতাসের কানে।

আর লাল সন্ধ্যার আঁচল যেই খ'সে পড়ে দূরে,
দাও গা এলিয়ে স্নেহে বারান্দায় নরম মাদুরে ;
ভেসে-চলা তোমার স্বপ্নের দল, পাখির কাকলি দিয়ে ভরা,
ছড়ায়, তোমারই মতো রমণীয়, ফুলন্ত পসরা।

হায় রে, দুলালী, কেন বেছে নিলি আমাদের এই
জনতাকাতর ফ্রান্স, যেখানে দুঃখের শেষ নেই ?
কেন তোর আজন্মের আদরিণী তেঁতুলতলারে
বিশাল বিদায় দিয়ে, নাবিকের বাহুর বিস্তারে
সঁ'পে দিলি জীবন, যৌবন ? কোনোদিন যদি পড়ে মনে—
পাৎলা মসলিনে কেঁপে শীত, শিলা, তুষারবর্ষণে—
দেখিস মধুর খেলা, ছেলেবেলা, আকাঙ্ক্ষার পটে,
তবুও চোখের জল ঠেলে রেখে, নিষ্ঠুর কর্সেটে
পিষ্ট স্তনে, ভিন-দেশী অঙ্গের আঘ্রাণ ফেরি ক'রে,
অন্ন খুঁটে খেতে হবে প্যারিসের পঙ্কিল খর্পরে—
এদিকে, ময়লা, ছেঁড়া কুয়াশায় তোর পথ-চাওয়া
খোঁজে ক্ষীণ, সুদূর গুপুরিদের বিষণ্ণ প্রেতের মতো ছায়া।

সিথেরায় যাত্রা

উড্ডীন পাখির মতো, মুক্তছন্দে উৎফুল্ল উত্তাল,
দড়িদড়া ছিন্ন ক'রে হৃদয় আমার ছুটে চলে,
দোলে নৌকা ক্ষণে-ক্ষণে রিক্তমেঘ আকাশের তলে,
যেন এক দেবদূত, রৌদ্রময় দিগন্তে মাতাল।

দেখা যায় কোন দ্বীপ— কালো, আর বিষাদে মলিন ?
—জানো না, সিথেরা ঐ, সেকালের শৌখিনের প্রিয়
মামুলি এলদোরাদো, গানে-গানে অবিস্মরণীয়।
কিন্তু যা-ই বলো, এই দেশ বড়ো ধূসর, শ্রীহীন।

—রহস্যে মধুর দ্বীপ, হৃদয়ের উজ্জ্বল উৎসব !
তার তটরেখা থেকে, যেন এক গন্ধের উচ্ছ্বাস,
ভেসে আসে সনাতন ভেনাসের দৃপ্ত প্রতিভাস,
ব্যাপ্ত করে আত্মায় আলস্য আর প্রেমের বৈভব।

সুন্দর, শ্যামল দ্বীপ পরিপূর্ণ পুষ্পিত বিতানে,
চিরকাল সর্বজাতি যার কাছে অর্ঘ্য নিয়ে যায়,
হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস কেঁপে ওঠে তন্ময় পূজায়,
যেমন গন্ধের দোলা গোলাপের বিলোল বাগানে,

কিংবা যেন বনতলে কপোতের শাশ্বত কূজন !
—কিন্তু তা তো নয় ! এ যে রুগ্ন এক বিশীর্ণ বিস্তার,
শিলাময় মরু, যাকে দীর্ণ করে কর্কশ চীৎকার।
অথচ অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখি ! নয় সে মোহন

ছায়াময় কুঞ্জবনে পরিবৃত মন্দির, যেথায়
তন্বী এক পূজারিনী প্রেম দেয় ফুলের বিলাসে,
এবং গোপন তাপে দগ্ধতনু, ভ্রমে অনায়াসে
অর্ধেক উন্মুক্ত ক'রে বেশবাস চঞ্চল হাওয়ায় ;

যখন আসন্ন তীর, উপকূলে তরী প্রতিহত,
ধবল পালের পটে নাড়ে ডানা ব্যাকুল পাখিরা,
দেখি এক ফাঁসিকাষ্ঠ, কৃষ্ণকায়, সুদীর্ঘ, ত্রিশিরা,
আকাশেরে দীর্ণ করে উদাসীন সাইপ্রেসের মতো।

ঝুলে আছে শব, তাতে শকুনেরা পংক্তিভোজে ব'সে
হিংস্র বেগে ছিঁড়ে নেয় পক্ব মাংস, রক্তমেদে মাখা,
শটিত পুঞ্জের মধ্যে, যেন তীক্ষ্ণ, কদর্য শলাকা,
হানে চঞ্চু অবিরাম, প্রত্যেকেই, নিষ্ঠুর আক্রোশে ;

রাইনের মারিয়া রিলকে

ভেনাসের জন্ম

ভোরের আগে সেই রাত্রি ছিলো ভীষণ।
রাত কেটে গেলো ছটফট ক'রে, হৈ-চৈ হুল্লোড়ে,
উল্লোল সমুদ্র খুলে গেলো আবার,
যেন ফেটে গিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো,
আর সেই চীৎকার যখন ভাটার টানে আস্তে এলো বুজে
আর আকাশে দিনের ম্লান উন্মেষ আর আলোর আরম্ভ
থেকে ফিরে এসে
আবার ডুবতে লাগলো বোবা মাছের অন্ধকারে—
সমুদ্র জন্ম দিলো।

প্রথম কয়েকটি রেখা কেঁপে-কেঁপে ঝলসে উঠলো
পীন তরঙ্গ-যোনির ফেনিল ঘন চুলে,
যোনিপ্রান্তে উঠে দাঁড়ালেন কন্যা,
শুভ্র, সিক্ত, উদ্‌ভ্রান্ত।
আর সবুজ তরুণ একটি পাতা যেমন একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে
আড়মোড়া ভাঙে, যা কুঁকড়ে লুকিয়ে ছিলো আস্তে-আস্তে খুলে যায়,
তেমনি উন্মোচিত হ'লো কুমারীর শরীর
ঝিরঝিরে ঠাণ্ডায়, আঙুল-না-লাগা ভোরবেলার হাওয়ায়।

স্পষ্ট বেয়ে উঠলো উপরে
দুটি চাঁদের মতো জানু
ঊরুর উপচে-পড়া মেঘের মধ্যে ডুব দিলো;
জঙ্ঘার কৃশ ছায়াটি হঠলো পিছনে,
পা দুটি এগিয়ে এলো, হ'লো উজ্জ্বল,
আর দেহের সব ক-টি জোড় তেমনি জীবন্ত হ'য়ে উঠলো
যেমন জীবন্ত তাদের কণ্ঠ
যারা পান করছে সুরা।

আর উদরটি শ্রোণীচক্রের পাত্রে
রইলো শুয়ে, যেন একটি তরুণ ফল ছোটো ছেলের কচি মুঠোয়,
আর সেখানে, নাভির সংকীর্ণ ভাণ্ড ভ'রে উঠলো
যে-অন্ধকারে, সে-ই তো এই প্রাণ, প্রাণের সমস্ত স্বচ্ছতা।
তারই তলায় আলগোছে উঁচু হ'য়ে
ক্ষুদ্র স্ফীতিটি উঠলো,
ঢেউ তুললো নিরন্তর কটিতটের দিকে
যেখানে থেকে-থেকে চিকচিক করছে একটি নিঃশব্দ জলরেখা।
যদিও ঈষদচ্ছ, স্তব্ধ আর ছায়াহীন
তবু এপ্রিলের একঝাড় রুপোলি বার্চগাছের মতো
রইলো প'ড়ে
উষ্ণ, শূন্য, অগুপ্ত, উন্মুক্ত যোনিদেশ।

দেখতে-দেখতে ছুটি কাঁধের গতিশীল সুষমা
যষ্টির মতো ঋজু দেহটির উপরে স্থির হ'লো,
উঠলো বেয়ে শ্রোণীচক্র থেকে ফোয়ারার মতো
নামলো ছুটি লম্বা বাহুতে বিলম্বিত লয়ে
নামলো দ্রুত, চুলের রাশি-রাশি ঝ'রে-পড়ায়।

তারপর ধীরে, অতি ধীরে মুখশ্রীর অগ্রস্থতি,
আনত ভঙ্গির পুরঃসংক্ষিপ্ত ম্লানতা
উজ্জ্বল উল্লম্ব উন্নীয়নে
হঠাৎ সমাপ্ত হ'লো চিবুকে।

এবার গ্রীবা দিলো বাড়িয়ে, যেন রোদ্দুরের একটি রেখা,
আর পুষ্পপ্রাণের প্রণালী, মৃণালের মতো বাহু,
বাহু ছুটিও এগোতে লাগলো মরালের গ্রীবার মতো
যখন মরালের দল তীরের দিকে ফেরে।

তারপর এই শরীরের অস্পষ্ট উন্মেষে
লাগলো হাওয়া, উষসীর শিহরণ, প্রথম গভীর নিশ্বাস।

শিরার গাছে-গাছে কোমলতম শাখায় জাগলো গুঞ্জন,
আর তারপর রক্তের রোল আরো গভীরে ছড়িয়ে পড়লো,
আর এই হাওয়া হ'লো প্রবল, আরো প্রবল, আর তারপর
তার নিশ্বাসের সমস্ত শক্তি দিয়ে তীব্র আঘাত করলো
নূতন স্তন দুটিতে,
ভ'রে তুললো তাদের, নিজেকে ভ'রে দিলো জোর ক'রে
তাদের মধ্যে,
আর তারা
দিগন্তে-ভ'রে-ওঠা ভরা পালের মতো
হালকা মেয়েটিকে তীরে নিয়ে এলো ঠেলে।

এমনি ক'রে দেবী মাটিতে নামলেন।

দেবী চললেন তারুণ্যের তীর দ্রুত ত্যাগ ক'রে,
আর তাঁর পিছনে
সমস্ত সকাল ভ'রে ফুটে-ফুটে উঠতে লাগলো
ফুল আর ঘাস, উষ্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত,
যেন আলিঙ্গন থেকে উঠে-আসা। দেবী চললেন কখনো হেঁটে,
কখনো ছুটে।

কিন্তু দুপুরের পরে, বেলা যখন সবচেয়ে ভারি,
আরো একবার সমুদ্র ফুলে উঠে
ছুঁড়ে ফেললো ঠিক একই জায়গায় একটা শুশুক,
মরা, ছেঁড়া, লাল।

হেমন্ত

পাতা ঝরে, পাতা ঝরে, ঝরে পাতা যেন দূর থেকে,
যেন উর্ধ্বে ঝ'রে যায় দূরতম প্রান্তের কানন।
আরো, আরো ঝ'রে যায়, ভঙ্গিতে জানায় প্রত্যাখ্যান।

আর ধীর রাত্রির গহনে পৃথিবীর ভার ঝ'রে যায়
তারার শৃঙ্খল থেকে নিঃসঙ্গ আঁধারে।

আমরাও ঝ'রে যাই। এই হাত— তাও ঝ'রে পড়ে
চরাচরে এই রোগ সংক্রমিত, মুক্তি নেই কারো।

তবু আছে একজন— তার হাত নির্ভার নির্ভরে
যত ঝরে, ধ'রে থাকে, তার ফাঁকে কিছুই ঝরে না।

অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট ১ : ৩

তা পারে দেবতা। কিন্তু মানুষ কেমনে
করে সেই সূক্ষ্ম-তার বীণার অনুসরণ ?
চেতনা দ্বিখণ্ড তার। আপোলোর মন্দির-তোরণ
ওঠে না, দ্বিধায়-ভরা-হৃদয়ের পথের সংগমে।

তুমি যে-গানের গুরু, সে তো নয় বাসনা, প্রয়াস,
নয় কোনো অন্তিম লক্ষ্যেরে পাওয়া, ফিরে-ফিরে সাধা ;
অস্তিত্ব— তা-ই তো গান। দেবতার তাতে নেই বাধা।
কিন্তু কবে আমাদের হবে ? কবে এই নক্ষত্র, আকাশ,

আর পৃথিবীরে, আমাদের ফিরিয়ে দেবেন তিনি ?
শোনো, ছেলে, সে তো নয় প্রেমে পড়া, যাতে আকস্মিক
আবেগে বাঁধন ছিঁড়ে মৌন মুখে ঠেলে ওঠে বাণী :

ভুলে যাও কোনোদিন গেয়েছিলে। সে-গান ক্ষণিক।
সার্থক গানের উৎস অন্য এক অলক্ষ্য নিশ্বাস।
নিশ্বসিত শূন্য এক। ঈশ্বরে শিউরে ওঠা। একটি বাতাস।

ফ্রীডেরিখ হ্যেল্ডার্লিন

মধ্যজীবন

বন্য গোলাপে পূর্ণ, নাসপাতির
হলুদে আক্রান্ত এই দেশ, ধীরে
নুয়ে পড়ে অচ্ছোদ হ্রদের প্রান্তে ;
সেখানে, লাবণ্যপুঞ্জ
মরালেরা, চুম্বনে মাতাল হ'য়ে, বার-বার
অধর ডুবায়ে দেয়
পুণ্যময় প্রশান্ত সলিলে।

অবশেষে যখন কঠিন শীত
দেখা দেবে, আমি তখন কোথায়
খুঁজে পাবো ফুলদল, রৌদ্রের উচ্ছ্বাস, আর
পৃথিবীর ছায়ার সম্পাত ?
ঠাণ্ডা দেয়াল শুধু
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে, স্বনিত হাওয়ায়
ঘূর্ণমান।

হাইপেরিয়নের অদৃষ্টের গান

তোমাদের বিচরণ ঐ ঊর্ধ্বে, হে পুণ্য কিন্নর,
আলোর প্লাবনময় কোমল কুট্টিমে,
দেবতার ভাস্বর বাতাস
ধীরে স্পর্শ ক'রে যায় তোমাদের,
যেমন বীণার
মন্ত্রপূত মূর্ছনায় গুণীর অঙ্গুলি।

দেবযোনি, স্বর্গের সন্তান,
ঘুমন্ত শিশুর মতো অদৃষ্টরহিত,
তোমরা নিশ্বাস নাও,
শুদ্ধচারিতায় সুরক্ষিত,
বিনম্র কোরকে
চিরকাল-বিকশিত আত্মা নিয়ে
মেলে রাখো নন্দিত নয়ন
চিরন্তন, স্থির, স্বচ্ছতায়।

কিন্তু আমাদের
নিয়তি দেয় না শান্তি ; তাপিত মানুষ,
ক্ষীয়মাণ,
অন্ধ বেগে
প্রহরে-প্রহরে
প'ড়ে যায়,
যেমন ঝর্নার জল
পাথরে-পাথরে প্রতিহত,
অবিরল অধঃপাতে, বৎসরের অনিশ্চয়তায়।

দিওতিমার প্রতি

সরস্বতী, স্বর্গের করুণা, তুমি একদিন উতরোল পঞ্চভূতে
সৌষম্যে মিলিয়েছিলে, এসো আজ শান্ত করো উচ্ছৃঙ্খল কালের প্রলয়!
মুগ্ধ করো উত্তাল যুদ্ধেরে, তব মন্ত্রপূত বীণার ঝংকারে—
যতক্ষণ মর্ত্যের হৃদয়ে পুন বিচ্ছিন্ন বৃত্তির
না ঘটে মিলন, জাগে সময়ের ফেনিল আবর্ত থেকে, সৌম্য, বলীয়ান,
অবিচল, তপঃকৃশ, মানুষের প্রতন প্রকৃতি!
পা রাখো মন্দিরে পুন, ফিরে এসো প্রীতিময় নবান্নপ্রাশনে
এসো জনতার দীর্ঘ-ক্ষুধিত আত্মায়, সৌন্দর্যের প্রাণলক্ষ্মী তুমি!

কেননা এখনো আছে দিওতিমা, বেঁচে আছে শীতে ম্লান মঞ্জরীর মতো,
সহজ ঐশ্বর্য নিয়ে, অথচ সূর্যের অপেক্ষায়।
কিন্তু সে-উজ্জ্বলতর বসুন্ধরা নেই আর, অস্ত গেছে আত্মার পরম সূর্য ;
আজ শুধু কলহকর্কশ বাত্যা হিমাক্ত নিশীথে ধাবমান।

বরিস পাস্টের্নাক

প্রত্যুষ

আমার নিয়তির সর্বস্ব ছিলে তুমি।
তারপর এলো যুদ্ধ, সর্বনাশ।
অনেক, অনেক দিন হ'য়ে গেলো
কোনো চিহ্ন নেই, খবর নেই তোমার।

এতকাল পরে
আবার তোমার কণ্ঠস্বরে আমি চঞ্চল।
সারা রাত ধ'রে পড়েছি আমি তোমাকে।
এ যেন এক মূর্ছা থেকে জেগে ওঠা।

লোকজনের সংসর্গ চাই আমি,
যেতে চাই ভিড়ের মধ্যে, সকালের ব্যস্ততায়।
মনে হয়, টুকরো ক'রে ভেঙে দিতে পারি সব-কিছু,
পারি ওদের ক্ষমা চাওয়াতে।

দৌড়ে নামি সিঁড়ি দিয়ে,
এই যেন প্রথম
বেরোচ্ছি তুষারে ঢাকা রাস্তায়
যার দুই দিকে ফুটপাত জনশূন্য।

চারদিকে আলো, গার্হস্থ্য, লোকেরা উঠে পড়ছে,
চা খাচ্ছে, ছুটছে ট্র্যাম ধরতে।
কয়েকটি মিনিটের ব্যবধানে
শহরকে আর চেনা যায় না।

ফটকে ঘন হ'য়ে তুষার জমলো
আর তার উপর ব্লিজার্ড বুনে চলেছে জাল।
ওদের সবারই তাড়াহুড়ো সময়মতো পৌছবে ব'লে,
অর্ধেক খাবার রইলো প'ড়ে, চা শেষ হ'লো না।

ওদের প্রত্যেকের জন্য আমার দরদ
যেন ওদের চামড়া আমারও,
গলমান বরফের সঙ্গে আমিও গ'লে·যাই,
ভোরের সঙ্গে কুঁচকে তুলি ভুরু।

আছে আমার মধ্যে নামহীন লোকেরা,
শিশুরা, কুনোরা, গাছপালা।
ওরা সবাই জয় ক'রে নিয়েছে আমাকে,
আর এই আমার একমাত্র বিজয়।

একটি রূপকথা

একদা রূপকথার দেশে
ঘোড়সওয়ার
টগবগিয়ে মাড়িয়ে চলে
স্টেপির পাড়।

সামনে তার যুদ্ধ। দূরে
আঁধার এক অরণ্য
ঝাপসা ধুলোর পর্দা ছিঁড়ে
আসন্ন।

হৃদয়ে অস্বস্তি, বলে
আঁচড় কেটে :
'জলের ধারে শঙ্কা, নাও
কোমর এঁটে।'

শুনলে না সে। মানলে শুধু
নিজের মন,
গাছে নিবিড় পাহাড় বেয়ে
চললো ছুটে জোর কদম ;

পাহাড় পার, মস্ত মাঠ
রইলো পিছে,
শুকিয়ে-যাওয়া ঝর্নারেখার
চিহ্ন ধ'রে নামলো নিচে।

উপত্যকায় পায়ের ছাপে
জানতে
পেলো, এ-পথ গেছে জলের
প্রান্তে।

সাবধানের শব্দ ওঠে
বারে-বারে ;
বধির, নিলো চালিয়ে তার
অশ্বটিকে জলের ধারে।

ঝর্না যেথায়
আঁকাবাঁকা অল্প জলে,
গুহার মুখে
গন্ধকের আগুন জ্বলে।

উগ্র লাল ধোঁয়ায় চোখ
মেঘলা হ'লো। অকস্মাৎ
অরণ্যেরে দীর্ণ ক'রে
উঠলো দূর আর্তনাদ।

চমকে ওঠে অশ্বারোহী :
'আমায় ডাকে !'
জবাব দিতে কঠিন হাতে
আঁকড়ে ধরে বর্শাটাকে ;

মিটিমিটি চক্ষে পড়ে
এবার তার
মুণ্ড, ধড়, লম্বা ল্যাজ
জন্তুটার।

একটি মেয়ে
বন্দী হ'য়ে প'ড়ে আছে
শঙ্কময় বপুর তিন-
ফেরতা প্যাঁচে।

হাঁ থেকে লাল ফুলকি ওড়ে ;
ফুলছে গলা,
যেন মেয়ের কাঁধের উপর
চাবুক তোলা।

রূপসীকে, রাজ্যে এক
নিয়ম আছে,
বলি দিতে হবে বিকট
আরণ্যক পশুর কাছে।

প্রজারা এই অর্ঘ্য দেয়
অজগরে,
বিনিময়ে দখল রাখে
বস্তিঘরে।

অবাধ সাপ বন্য সাধ
মিটিয়ে নিতে
রূপবতীর কণ্ঠ, বাহু
বাঁধে কঠিন কুণ্ডলীতে।

অশ্বারোহী প্রার্থনায়
পাঠালে চোখ ঊর্ধ্বে ;
বর্শা উঁচু করো এবার
যুদ্ধে।

রুদ্ধ চোখ।
পাহাড়। মেঘ। জলের স্বর
পাথর। নদী।
বছর। যুগ। যুগান্তর।

রক্তমাখা ; লোহার টুপি
লুটোয় দূরে ;
থেঁৎলে যায় সর্প, তার
ঘোড়ার খুরে।

ছড়িয়ে আছে বর্শা আর
অশ্ব, নাগ, বালুর 'পরে ;
মূর্ছিত সে ; সংজ্ঞাহীন
কন্যা প'ড়ে।

স্নিগ্ধ নীল ঝামরে নামে,
দুপুর ভ'রে গুনগুনানি।
এই মেয়ে কে? কিষানী? রাজ-
কন্যা? রানী?

কখনো ঘোর পুলকে নামে
বিরামহীন অশ্রুধারা,
কখনো তারা মরণঘুমে
আত্মহারা।

কখনো তার স্বাস্থ্য ফেরে,
তাকায় চোখ একবার;
কখনো ফের রক্তপাতে
নিঃসাড়।

কিন্তু হৃৎপিণ্ড বাজে।
কন্যা, বীর, জাগবে ব'লে
বারেক কেঁপে, নিদ্রাবেশে
আবার ঢলে।

রুদ্ধ চোখ।
পাহাড়। মেঘ। জলের স্বর।
পাথর। নদী।
বছর। যুগ। যুগান্তর।

এজরা পাউণ্ড

বিষাদ-গাথা

শক্র, সে যে শক্র, তার এই তো খেলা
আড়াল থেকে যুদ্ধ চালায়।

আমার প্রাণ একলা শুয়ে ডাকলো কত
শিশু যেমন ঘুমের সময়,
আমার হাত খুঁজলো তাকে সমস্ত রাত—
প্রেমিক হাত সে কি ঘুমোয়।

কিন্তু শোনো, সবার উপর সত্য এই :

ডাকবে তাকে শক্র ব'লে, শক্র সে যে, আড়াল থেকে যুদ্ধ চালায় ;
মিলবে তার সঙ্গে যেমন রাতের হাওয়া অশ্লেষার প্রান্তে মিলায়।

প্রেমের খেলা খেলেছি কত বার,
ছুঁড়েছি পাশা সত্য ক'রে পণ,
স্বচ্ছ চোখে হেরেছি তার কাছে
ব্যথার পূজা করিনি নিবেদন।

বাকি কিছুই নেই তো আর, লাফিয়ে উঠি নগ্ন ধার,
কিন্তু শোনো, এ ছাড়া আর সত্য নেই :

যে হারে তার শক্রতায় সমান-সমান
ফিরতি প্যাঁচে সে-ই জেতে।
বিদ্যুতের লাল আগুন ছুঁড়েও দেখি
অন্ত শেষ নেই এতে :
তার কাছে যার তলোয়ারের ভাঙলো জোর
কিস্তিশেষে সে-ই জেতে।

শক্র, সে যে শক্র, তার এই তো খেলা, আড়াল থেকে কুটিল চাল।
যে-অভাগায় হারাতে তার অবহেলা তারই যে চাই কঠিন ঢাল।

এজরা পাউণ্ড অবলম্বনে

অমরতার গান

প্রেমের গান গাও, কুড়েমি করো,
প্রেমের গুণ গাও, কুড়েমি করো,
কী হবে আর সব দিয়ে বা।

খুব তো ছোটা হ'লো দূরের পিছে
চোখের মাথা খেয়ে পুঁথিও লুঠ,
প্রেমের নুন খেলে ও-সব মিছে,
কী হবে আর সব দিয়ে বা।

মনস্তাপে ফুল যায় তো ঝ'রে যাক,
আমার সুখ সে তো আমার আছে ;
প্রেমের গানে সব আবার বাঁচে,
কী হবে আর সব দিয়ে বা।

কেমনে তিব্বতে রাস্তা খুঁড়ি,
কেমনে তেহেরানে মন্ত্রী হই,
কেমনে কাবুলের তক্তে চড়ি—
কুড়ের গান সে তো ফুরায় না।

ই. ই. কামিংস

যখন র'বো না আর মর্ত্য ছাঁচে

যখন র'বো না আর মর্ত্য ছাঁচে

আমার দু-চোখ থেকে ঝুলবে গাছে
গাছের ফুর্তিভরা ফলের চিকন

বৃন্তে দিগন্তের নারেঙ্গি রং
আমার ঠোঁটের ফাঁকে স্তম্ভিত গান

আনবে গোলাপে ফাল্গুনের উজান
কামতাপিত কুমারী তার ছোট্ট গোপন

স্তনের ফাঁকে সে-ফুল করবে রোপণ
আমার আঙুলে বেগ তুষার ফুঁড়ে

পাখির পরিশ্রমে চলবে উড়ে
উঠবে ঘাসের পথে ঢেউ সে-পাখার

যেখানে একলা হাঁটে কান্তা আমার
এদিকে সমুদ্রের রঙ্গে দ্বিগুণ

দুলবে আমার হৃৎপিণ্ড দারুণ

হে সুন্দরী স্বতঃস্ফুট পৃথিবী কত বার

হে সুন্দরী
স্বতঃস্ফুট পৃথিবী কত বার
চিমড়োনো চিন্তাশীলের নোংরা ঘুণধরা

আঙুল তোমাকে
খুঁটে
খুঁচিয়ে
চিমটি কেটে অস্থির করেছে

তোমাকে
,বিজ্ঞানের বজ্জাত বুড়ো আঙুল তোমাকে
টিপে
টিপে
খুঁজেছে তোমার
মাধুরী ,কত

বার পালে-পালে পুরুৎ তোমাকে
হাড্ডিসার হাঁটুতে তুলে
চেপে
চেপে

কুস্তি ক'রে জন্মাতে চেয়েছে তোমার গর্ভে
দেবতা
(কিন্তু
তুমি

তোমার ছন্দে-বাঁধা
মৃত্যুদয়িতের
অপরূপ বাসরে সতী তুমি

তাদের জবাবে শুধু
বসন্তের ফুল

ফোটাও

ওয়ালেস স্টীভন্স

নির্জন প্রাসাদ

মন্দ হ'লো ? আশা ক'রেই এসেছিলাম,
এসে দেখি সেই বিছানায় কেউ নেই।

থাকতো যদি এলোচুলের সর্বনাশ,
ঠাণ্ডা হাতের কঠিন চোখের বিরুদ্ধতাও।

থাকতো যদি খোলা পাতায় একলা আলো
একটি-দুটি হৃদয়হীন পদ্যে ফেলা।

থাকতো যদি পর্দা জুড়ে অন্ধকার
শুধু হাওয়ার অন্তহীন নির্জনতা।

হৃদয়হীন পন্থ? দুটি-চারটি কথায়
কেবল সুর বাঁধা যে সুর বাঁধা যে সুর বাঁধা।

ভালোই হ'লো। সেই বিছানায় কেউ নেই,
ভব্যতার শক্ত ভাঁজে পর্দা ফেলা।

কালিদাস

'মেঘদূতে' যক্ষপ্রিয়া

(উত্তরমেঘ)

৮৫

তন্বী, শ্যামা, আর সূক্ষ্মদন্তিনী, নিম্ননাভি, ক্ষীণমধ্যা,
জঘন গুরু ব'লে মন্দ লয়ে চলে, চকিত হরিণীর দৃষ্টি,
অধরে রক্তিমা পক্ক বিম্বের, যুগল স্তনভারে ঈষৎ-নতা,
সেথায় আছে সে-ই, বিশ্বস্রষ্টার প্রথম যুবতীর প্রতিমা।

৮৬

আমি-যে সহচর রয়েছি দূরে, তাই একেলা যেন এক চক্রবাকী,
ক্বচিৎ কথা বলে, দীর্ঘ দিনমান কাটায় ঘোর উৎকণ্ঠায়,
তুহিনমন্থনে যেমন পদ্মিনী, অন্যরূপা তাকে মনে হয়—
মেনেছি, সে আমার দ্বিতীয় প্রাণ, তাকে, জলদ, তা-ই ব'লে জানবে

৮৭

ব্যাকুল, অবিরল রোদনে রঞ্জিত বিস্ফারিত আঁখি প্রেয়সীর,
অধরশোণিমার বর্ণ অপগত, শীতল নয় ব'লে নিশ্বাস,
স্রস্ত কেশ আর ন্যস্ত কর, তাই যায় না দেখা মুখ অবিকল—
যেথায় মুকুরিত তোমার তাড়নায় পীড়িত ইন্দুর দৈন্য।

বুঝি বা সেক্ষণে পূজায় মনোযোগী— দেখতে পাবে তাকে অচিরে,
অথবা অনুমানে আঁকছে প্রতিকৃতি বিরহে-ক্ষীণতনু আমারই,
শুধায় নতুবা সে— মঞ্জু বাণী যার, পিঞ্জরিতা সেই সারিকায়,
'সোহাগী তুই তাঁর, স্বামীরে কখনো কি পড়ে না মনে, ওলো রসিকা ?'

৮৯

অঙ্কে নিয়ে বীণা, মলিন বেশবাসে হয়তো গান ধরে কখনো,
আমার নাম দিয়ে রচিত পদে এসে ব্যর্থ হয় সেই বাসনা ;
চোখের জলে ভেজা বীণার তারে যদি পারে বা কোনোমতে বাজাতে,
অনেক অভ্যাসে স্বকৃত মূর্ছনা— তাও সে বার-বার ভুলে যায়।

৯০

রেখেছে প্রতিদিন ভবন-দেহলিতে একটি ক'রে ফুল সাজিয়ে,
ভূমিতে রেখে তা-ই গণনা করে, আর ক-মাস বাকি আছে বিরহের ;
কিংবা সে আমার সঙ্গ করে ভোগ, কল্পনায় যার জন্ম—
প্রায়শ এইমতো বিনোদ খুঁজে নেয় রমণবিরহিণী মেয়েরা।

৯১

ব্যাপৃত দিবাকালে তোমার সখী নয় বিরহভারে তত খিন্ন,
কিন্তু মানি ভয়, বিনোদব্যতিরেকে দুঃখে ভরা তার যামিনী ;
দেখবে সাধ্বীরে ভূতলশয্যায়, নিদ্রালেশ নেই চক্ষে,
মহৎ সুখ দিয়ো, সৌধবাতায়নে আমার সমাচার জানিয়ে।

৯২

বিরহশয্যায় শুয়েছে একপাশে, শীর্ণ তনু মনোকষ্টে,
পূর্বাকাশে যেন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের শেষ কলা উদিত,
আমাকে নিয়ে তার যে-নিশি কেটে গেছে স্বেচ্ছাশৃঙ্গারে ক্ষণিকে,
এখন বিচ্ছেদে দীর্ঘায়িত হ'য়ে অশ্রুজলে হয় অবসান।

৯৩

এখনও জানালায় শীতল চন্দ্রমা ছড়ায় অমৃতের স্পর্শ,
পূর্বপ্রীতিবশে দৃষ্টি ছোটে তার, কিন্তু ফিরে আসে তখনই,
অশেষ বেদনায় নয়ন ঢেকে যায় অশ্রুভারাতুর পক্ষ্মে—
মেঘলা দিনে যেন মলিন কমলিনী, জেগেও নেই, নেই ঘুমিয়ে।

৯৪

শুদ্ধস্নান করে, অলক অতএব রুক্ষ হ'য়ে, বিস্রস্ত,
কপোলে নেমে আসে, তাপিত নিশ্বাসে ক্লিষ্ট অধরের কিশলয় ;
ঘুমেরে সাধে কত, যদি বা অন্তত স্বপ্নে বুকে পায় আমাকে,
অথচ কান্নার আক্রমণে তার কোথায় সুপ্তির অবকাশ।

৯৫

মাল্য ফেলে দিয়ে বেঁধেছে একবেণী বিরহদিবসের প্রথমে,
শাপের অবসানে বিগতশোক আমি ছাড়ায়ে দেবো তার গ্রন্থি,
পরশে কর্কশ কঠিন সেই বেণী গণ্ডদেশ থেকে বার-বার
যে-হাতে ঠেলে দেয়, হেলায় এতকাল কাটে না তার নখপংক্তি।

৯৬

অসহ বেদনায় কখনো উঠে বসে, এমনি বার-বার শয্যাতলে
ভূষণবর্জিত পেলব তনু তার ন্যস্ত করে সেই অবলা,
নবীন জলময় অশ্রু নিশ্চয় মোচন করাবে সে তোমাকেও,
অন্তরাত্মায় আর্দ্র যারা, প্রায় করুণাশীল তারা সকলেই।

৯৭

তোমার সখী তার স্নেহের সম্ভার, জেনেছি, আমাকেই দিতে চায়,
তাই তো অনুমান, প্রথম বিচ্ছেদে এমনি শোচনীয় দশা তার ;
এ নয় বাচালতা— 'ভাগ্যবান আমি,' তা ভেবে, অভিমানবশত,
আমার বিবরণ অচিরে অবিকল আপন চোখে, ভাই, দেখবে।

৯৮

স্রস্ত কুন্তলে রুদ্ধ বিস্তার, স্নিগ্ধকজ্জলশূন্য,
সুরার পরিহারে ভুলেছে ভ্রূবিলাস, এমন বাম আঁখি মৃগাক্ষীর—
তোমার আগমনে ঊর্ধ্বকম্পনে যে-শোভা করি তার অনুমান,
তুলনা সে-রূপের ক্ষুব্ধ মৎস্যের আঘাতে চঞ্চল কুবলয়।

৯৯

গৌর বরনে যে তুলনা আনে মনে সরস কদলীর কাণ্ড,
দৈবে এক্ষণে আমার চিরচেনা মুক্তাজাল যার ত্যাজিত,
আমার নখে আর যে নয় চিহ্নিত, পায় না সম্ভোগ-অন্তে
আমারই হস্তের সংবাহন-সুখ, হবে সে-বাম ঊরু স্পন্দমান।

১০০

যদি বা সেক্ষণে নিদ্রাসুখ তার ভাগ্যে জুটে থাকে দৈবে,
জলদ, গরজনে বিরত, সাবধানে প্রহরকাল থেকো অপেক্ষায় ;
প্রেমিক-আমি তার স্বপ্নে কোনোমতে লব্ধ হ'লে পরে, তখনই
কোরো না বিচ্যুত কণ্ঠ হ'তে সেই গাঢ় ভুজলতা-বন্ধন।

১০১

তোমার জলকণা ব্যাপ্ত যাতে, সেই বাতাসে মানিনীরে জাগিয়ে
আননে আশ্বাস আনবে, মালতীর নবীন মুকুলের তুল্য,
লুকোবে বিদ্যুৎ, যখন সে তোমায় দেখবে অনিমেষে জানালায়,
তোমার ধ্বনিরূপ বচনে ধীরে-ধীরে বলবে এইমতো বার্তা।

য়ুয়ান চন (৭৭৯-৮৩৯)

মৃতা পত্নীকে

বাপের ছোটো মেয়ে, আদরিণী তুমি,
অদৃষ্টের দোষে এই গরিব পণ্ডিতের হাতে পড়লে।
আমার ছেঁড়া জামায় চোখ নামিয়ে যখন রিপু করতে,
আমি মিষ্টি কথায় তোমার মন ভিজিয়ে, আস্তে
একটি-দুটি সোনার কাঁটা খুলে নিতাম খোঁপার—
মদ কেনা চাই তো।
রাঁধতে বুনো আনাজ
পাতা পুড়িয়ে উনুন জ্বেলে।
...আজ শুনছি ওরা সভা ডাকছে, আমার লাখ টাকার ডালি নাকি তৈরি—
আজ তোমায় কী দেবো তা-ই ভাবি।
তোমার নামে মন্দিরে পুজো ? এই ?

২

কে আগে মরবে বলো তো ? আমি ! না, আমি !
কত ঠাট্টা দু-জনে ব'সে করেছি।

একদিন হঠাৎ তুমি চ'লে গেলে—
আমার চোখের উপর দিয়ে, তুমি।
তোমার জামাকাপড় সবই প্রায় বিলিয়ে দিলাম,
তোমার শেলাইয়ের বাক্স খুলে দেখতে সাহস হয় না।
ঝি-চাকর সকলের দিকে তোমার হাত ছিলো দরাজ,
আমিও সেটা রেখেছি, কিন্তু তোমার মতো হয় না।
…বুদ্ধের কথা সত্য, বেঁচে থাকলে প্রিয়বিয়োগ হবেই,
কেউ নিস্তার পায় না ;
তবু বলি, একসঙ্গে আধপেটা খেয়ে দিনের পর দিন যাদের
কেটেছে,
এ-দুঃখ তাদের মতো কি আর কারো।

৩

দুঃখ শুধু তোমার জন্য ?
না, নিজের কথাও ভাবি।
সত্তর হ'তে কত আর দেরি আমার ?
আমি তো ভালো-মন্দয় সাধারণ—
দেখেছি মহৎ মানুষ, কে জানে কার শাপে নিঃসন্তান।
আমি তো চলনসই পদ্য লিখি,
শুনেছি মহাকবির কথা, তাঁর ডাকেও ওপার থেকে
সাড়া দেননি ঘরনী।
মৃত্যুর পরে মিলন ?
বিশ্বাস করি না, তুমিও কোনোদিন করোনি।
সেই অন্ধকারেই শেষ, আর আশা নেই, জানি।
তবু
রাত্রি ভ'রে চোখ মেলে তাকিয়ে
আমি দেখতে পাই
তোমার মেঘলা কপালে
তোমার সমস্ত জীবনের সংসার চালাবার

ছোটোদের কবিতা

রামধনু

'বীরু, বুলু, রবি সব ছুটে আয়—
তিনু, মিলি আর মনু,
চাস যদি তোরা দেখতে একটা
সাতরঙা রামধনু !
বাবা-মা এসো গো, বামা-ঝি, রামজী,
এসো ছোড়দাদা, ন'দি—
আকাশ-জোড়া এ-রামধনু চাও
দেখতে যদি ।'

ছোট্ট কমল, দুষ্টু কমল
ভুলে গিয়ে বল খেলা,
চীৎকার ক'রে ডাকলো সবায়
সেদিন বিকেলবেলা ।
বৃষ্টির পরে ঝিলিমিলি রোদ
ঝিকিমিকি রামধনু ;
ছুটে এলো রবি, বীরু আর বুলু,
মিলি আর তিনু, মনু ।

ছোট্ট পায়ের শব্দে, পাখির
কিচিরমিচির চুপ ।
হালকা হাতের হাততালি শুনে
গাছগুলি খুশি খুব ।
মিষ্টি কথার ঢিল খেয়ে-খেয়ে
ফুলপাতা টলমল—
ছোট্ট কমল, দুষ্টু কমল,
মিষ্টি কমল !

মিষ্টি সবাই, দুষ্টু সবাই
ছোট্ট সবাই—
ঠিকরে কোথায় ছুটে ছিটকায়,
নেই ঠিক-ঠিকানাই।
বুলু, বীরু, রবি চোখ তুলে চায়,
মিলি, তিনু আর মনু—
লাফায়, চ্যাঁচায়, চোখ তুলে চায়,
চোখ তুলে ছাখে আকাশের গায়
ঝলমল রামধনু।

মা-বাবা তখন চায়ের টেবিলে,
বামা-ঝি সাজছে পান,
রামজী হেঁশেলে মশলা পিষছে,
ছোড়দা করছে স্নান।
ছোটো আরশিতে চুলের খোঁপাটা
দেখছে ন'দি ;—
'শিগগির ছুটে এসো, রামধনু
দেখবে যদি।'
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো কমল,
বীরু, বুলু, মিলি, মনু—
আকাশের গায় এক মিনিটের
সাতরঙা রামধনু।

পেয়ালা ফুরুলে মা-বাবা এলেন ;
ন'দি, খোঁপা ঠিক ক'রে ;
ছোড়দাও এলো— গন্ধ-রুমাল
পকেটে ভ'রে।

বামা-ঝি এলো না— সাজছে সে পান
একলা ব'সে,
রামজী এলো না— রাতে রান্নার
মশলা পিষছে ক'ষে।

বাবা-মা বলেন, 'কোথায়? কোথায়?'
ন'দি এসে বলে, 'কই?'
ছোড়দা বলছে, 'কিছু তো দেখিনে
আকাশে আকাশ বই।'
ওরা সাতজনে ছুটোছুটি করে,
হাততালি দিয়ে নাচে,
ওরা সাতজনে উল্টিয়ে পড়ে,
হেসে না বাঁচে।
'আমরা দেখেছি, আমরা দেখেছি,
তোমরা জব্দ হ'লে!'
দুষ্টু কমল নাচে আর হাসে
এ-কথা ব'লে।
বীরু, বুলু, রবি নাচে আর হাসে,
তিনু, মিলি আর মনু—
'আমরা দেখেছি— আমরা দেখেছি
ঝলমল রামধনু!'

ঘুমের সময়

জ্বলিছে নরম মোম
ছোটো মোর ঘরে,
জ্বলিছে নতুন চাঁদ
মেঘের শিয়রে।
এক মুঠো ছোটো চাঁদ,
কত আলো তার,
এক মুঠো মিঠে আলো
বালিশে আমার।
মোমের নরম চোখে
স্বপ্নেরা ঝরে,
ঘুমের নরম চুমো
দুই চোখ ভ'রে।

পরিমল-কে

পদ্য যদি লিখতে তুমি পরিমল,
মুগ্ধ হতাম সকলে,
হার মানাতে নামজাদা সব কবিদের
ছন্দ-মিলের দখলে।
যত কথা— আজগুবি আর অসম্ভব
ঘুরছে তোমার মগজে,
দয়া ক'রে কলম নিয়ে একটানা
লিখতে যদি কাগজে !
কিন্তু তুমি নিজে কিছুই লিখলে না—
আমায় দিলে উৎসাহ,
তুমি আমায় করলে তোমার রাজকবি,
আমি তোমায় বাদশাহ

ফল যা হ'লো, দেখতে তো তা পাচ্ছোই—
এই যে ছোটো বইখানা,
আগাগোড়া একটি ছড়াও নেই এতে
তোমার যেটা নয় জানা।
পাবো অনেক নিন্দে, খানিক প্রশংসা,
কে-ই বা গায়ে তা মাখে!
ভালোবাসার সঙ্গে দিলাম, পরিমল,
আমার এ-বই তোমাকে।

আমরা যখন ছোটো ছিলাম, পরিমল,
মনে কি নেই কী হ'তো?
ইচ্ছে হ'লেই চ'লে যেতাম ইস্পাহান,
কটোপাক্সি, কিয়োতো।
জ্যোছনা-রাতে দেখতে পেতাম পরিদের
জানলা থেকে লুকিয়ে,
অন্ধকারে ভূতের পায়ের আওয়াজে
রক্ত যেতো শুকিয়ে।
এখন— মোরা যেথায় আছি, দিনরাত
আটকে আছি সেখানেই,
চাঁদের আলোয় নাচে না আর পরিরা,
ভূত-পেরেতের দেখা নেই।
কিন্তু তোমার সঙ্গে থেকে, পরিমল,
ফিরলো মনে সেই সব,
মনে হ'লো রাখবো বেঁধে কবিতায়
তোমার আমার শৈশব।
অমনি, ছাখো, কাগজ নিলাম একরাশ,
কালি নিলাম দোয়াতে,
যা লিখেছি উজাড় ক'রে, পরিমল,
দিলাম তোমার দু-হাতে!

বারো মাসের ছড়া

সবচেয়ে ভালোবাসি বৈশাখ মাস,
মূর্ত আশার মতো দীপ্ত আকাশ।
জ্যৈষ্ঠের খর তাপ তীব্রপরশ,
রোদ্দুরে যত রোষ আমে তত রস।
দীর্ঘ দ্বিপ্রহর অবসরে ভরা,
সূর্য অস্ত যেতে করে না তো ত্বরা।
আষাঢ় আঁধার হ'য়ে আকাশে ছড়ায়
পাখা-পাওয়া পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায়।
দলে-দলে চলে মেঘ, জ্বলে বিদ্যুৎ,
হঠাৎ বজ্র বাজে, বৃষ্টির দূত।
তারপর শ্রাবণের রিমঝিম রাত,
জুঁইফুলে গন্ধের স্বপ্ন-প্রপাত।
চুপ ক'রে শুয়ে-শুয়ে কী-যে ভালো লাগা,
জেগে-জেগে ঘুম আর ঘুমে যেন জাগা।
ঝরোঝরো ঝরে জল অতল অথই,
মনে হয় আমি যেন রুমি আর নই।
নই আর ছোটো মেয়ে দাঁত নড়ো-নড়ো,
কাউকে না-ব'লে আমি হ'য়ে গেছি বড়ো।
টুটুকে, দিদিকে, মা-কে গিয়েছি ছাড়িয়ে
নাগাল পান না বাবা দু-হাত বাড়িয়ে।
আমি যেন গল্পের, আমি যেন কোন
স্বপ্নের কাঞ্চনকুমারীর বোন।
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি সেই আছি ছোটো,
মা বলেন, 'বেলা হ'লো, রুমুমণি ওঠো।'
ভাদ্রের মুখে হাসি, চোখে তবু জল,
ঝরায় বাদল তার শেষ সম্বল।
আকাশে একটু লাগে নীলের পালিশ
ঝিকমিক রোদ ঠিক টাটকা ইলিশ।

রৌদ্রের রুপো হ'লো সোনা একদিন,
পুজোর গন্ধ নিয়ে এলো আশ্বিন।
গাল-ফোলা শাদা মেঘ আহ্লাদে খেলে,
সূর্যের একপাল উজ্জ্বল ছেলে।
কার্তিক ক্লান্তির কুয়াশায় মিশে
অঘ্রানে ডেকে আনে ধান্যের শিষে।
ছোটো হ'য়ে আসে দিন, বেলা পড়ে ঢ'লে
পৌষের সুন্দর রৌদ্রের কোলে।
পাঁচটা না-বাজতেই সূর্য পলায়,
লম্বা ঘুমের রাত লেপের তলায়।
কালোকেলো কই মাছ লাল তেলে ভাসে
সবুজ মটরশুঁটি সাজে পাশে-পাশে।
আজ ভাবি, কাল ভাবি শীত বুঝি যায়
উত্তুরে হাওয়া তার উত্তর দ্যায়।
মর্মরে ঝংকারে মাঘ এলো ঐ,
গাছে-গাছে ডালে-ডালে লাগে হৈ-চৈ।
আজ কেন সব-কিছু লাগছে নতুন?
গুনগুন গুঞ্জনে এলো ফাল্গুন।
উঁকি দেয় উৎসুক আম্রমুকুল,
তারি ফাঁকে কোকিলের বসে ইশকুল।
বাক্সে লুকায় যত কম্বল শাল,
হঠাৎ হাওয়ায় লাগে চৈত্রের তাল।
দিলখোলা দক্ষিণ, হালকা শরীর,
কত যেন ফুর্তির দিন-রাত্তির।
উত্তাপে উৎসাহ উচ্ছলে প্রাণে,
কাঁচা আম গ্রীষ্মের আশ্বাস আনে।
ঐরাবতের মতো বৈকালী মেঘে
উত্তাল ওঠে কালবৈশাখী রেগে।
ঝঞ্ঝায় উড়ে যায় পুরোনোর দায়
চৈত্রের সন্ধ্যায় বর্ষবিদায়।

চম্পাবরন কন্যা

রংমশালের সম্পাদকের চম্পাবরন কন্যা
ঘর করেছেন আলো ;
সমস্ত তাঁর ভালো।
দোষের মধ্যে একটি শুধু রাত্তিরে ঘুমোন না।
রাত্তিরে ঘুমোন না ;
পূর্ণ চাঁদের তাড়ার মতো,
প্রথম-ফোটা তারার মতো,
সন্ধ্যা হ'লেই তন্দ্রা-হারা চম্পাবরন কন্যা।
চম্পাবরন কন্যা ;
চোখ দুটি তাঁর কালো,
ঘর করেছেন আলো
দোষের মধ্যে সমস্ত রাত একটুও ঘুমোন না।
একটুও ঘুমোন না ;
কাঁদেন এবং কাঁদান তিনি,
হাত-পা ধ'রে সাধান তিনি,
রাত-জাগাদের রাজকুমারী হবেন তিনি কোন না।
হবেন তিনি কোন না
ঘুম-পাড়ানি বঙ্গে
ঘুম-তাড়ানি সংঘে
বক্তৃতাতে তর্কাঘাতে আপন নামে ধন্যা।
নাম না-হ'তেই ধন্যা,
যত ইচ্ছে শতছিদ্র
কোরো তুমি মূঢ়নিদ্র
ভবিষ্যতের বঙ্গভূমে— লক্ষ্মী তো, এখন না।
লক্ষ্মী তো, এখন না ;
সম্পাদকের ঘুম খসালে
কেমন ক'রে রংমশালে
পদ্য বেঁধে তোমার পায়ে বলো তো দিই ধন্না !

রুমির পত্র— বাবাকে

ও বাবা, ও বাবা
দিদি বললে আমায়, 'হাবা !
তুই এটাও বুঝিস না !
নিজে পত্ত বানিয়ে
বাবা ভোলান তা নিয়ে
নেই সত্যি পরি-মা।
বলে বিজ্ঞানে কী, জানিস,
আছে অনেক রকম জিনিশ,
অনেক অদ্ভুত জন্তু,
জন্মদিনের পরি,
কিংবা জ্বর তাড়ানো পরি
নেই সত্যিই কিন্তু।
ও-সব কুসংস্কারেই
দেশের দশা হ'লো এই,
এখন জওহরলালজী
যদি চল্লিশ কোটির
দেন ফরমাশ রোটির
তবে লঙ্কা, আটা, ঘি
নিয়ে লাগবে যারা কাজে
বল তাদের কাছে বাজে
তোর পরির মতো কী !'
আমি ভাবছি ব'সে তাই ;
যদি তিমি দেখতে চাই
পাবো ছবি দেখতে বইয়ের,
তাতে বোঝাই যাবে না
তার কত্ত বড়ো হাঁ
যেন জাহাজ-খাওয়া ঢেউয়ের

আর যখন ঘুমের আগে
আমার কেমন ভালো লাগে—
শোনো সত্যি কথাটা—
আমি ঠিক দেখতে পাই
তুমি যা লিখেছো তা-ই
সেই চিঠির পরি-মা।
নিজ চক্ষের দেখায়
বুঝি মিথ্যেই শেখায়,
আর সত্যি হ'লো তা-ই,
যা ককৃখনো দেখিনি,
জল-পাহাড়ি তিমির
মাইল-জোড়া হাই!
দিদির বিজ্ঞানের বই
ভুল করেছে নিশ্চয়ই—
সত্যি না, বাবা?
যদি পরি না-ই থাকে
তবে বলো তো কোন ফাঁকে
মনে জাগলো পরির ভাবা?
বাবা তুমি নিজেই ঐ
না-হয় পদ্য লিখেছোই
কিন্তু পরি-মা
সত্যি যদি না হন
তবে তুমি-ই বা কেমন
ক'রে জানলে কথাটা!
আমার মনে হচ্ছে, শোনো,
পরি- মায়ের কোনো-কোনো
কথা মোটেও শুনিনি,
তাই না-ব'লে-ক'য়ে
সত্যি মিথ্যে হ'য়ে
মিলিয়ে গেলেন উনি?

দিদিকে লাল ফিতে
মা-কে যেই দেখেছি দিতে
কেঁদে বাধিয়েছি সেই হাট,
হয়নি আমার করা
কিছু তেমন লেখাপড়া
আজ বয়স হ'লো সাত।
খাবার সময় মিছিমিছি
আমার আছেই চ্যাচামেচি,
সেটা বড়োই বিশ্রী,
আর আঁচল ধ'রে মা-র
ঘ্যানঘেনে আবদার
না- ক'রেই পারিনি।
আমার এ-সব দোষে
দূর আকাশ-পারে ব'সে
পরি-মা রাগ ক'রে
আমায় দিলেন ফাঁকি ?
বাবা, সত্যিই তা-ই নাকি ?
রাখো, রাখো ধ'রে।
আমি মন করলেম আজই
মুখে আনবো না আর পাজি,
কক্- খনো না, কক্‌খনো,
আর নাকি সুরের কাঁদা,
কিংবা বেড়াল-গলা সাধা
আমার আবার যদি শোনো
তবে বেসো না আর ভালো,
তবে যা ইচ্ছে তাই বোলো—
কিছু বলতেও হবে না,
অঙ্ক আর ইংরিজি
আমি শিখবো নিজে-নিজেই—
বলো, সত্যি পরি-মা !

আমি   সত্যি হবো ভালো,
বাবা,   সত্যি ক'রে বলো,
দিদি   কিচ্ছু জানে না,
আমার চোখেই আঁকা সে
ঐ   দূরের আকাশের
আমার   সত্যি পরি-মা।

পরি-মার পত্র— বাবাকে

শুনুন, মশাই শুনুন,
আপনি   যতই কথা বুনুন,
ছড়া   যতই বাঁধুন না,
কেউ   মানবে না আর, আছে
কোথাও দূরে কিংবা কাছে,
কোনো সত্যি পরি-মা।
যখন   ছোট্ট ছিলো রুমি,
ছিলো   কুট্টুস, টুনটুনি,
ঠিক   দেখতে পেতো আমায়,
ঐ   দূরের আকাশে
যেমন   মেঘেরা ভাসে
চাঁদের আলোর জামায়।
তখন   জন্মদিনের ভোরে,
কিংবা জ্বরের ঘোরে
রুমি   বলতো, 'ও বাবা!
আমার   মনে হচ্ছে আজই
হবেন   পরি-মা ঠিক রাজি
আমায়   চিঠি লিখতে আবার!

ঐ কথা যেই শোনা,
আমার অমনি আনাগোনা
রুমির পাশে-পাশে,
যেমন হাওয়ার হাত
নাড়ে আহ্লাদে হঠাৎ
গাছে, পাতায়, ঘাসে।
সেই আহ্লাদি রুমির
অফু- রন্ত ঝুমঝুমির
আর ছন্দ শুনি না ;
আর ছোটো তো নেই— ষাট—
আজ বয়স হ'লো আট
রুমি ন'য়ে দিলো পা।
সেই কুটুস, টুনটুনি
আজ ইশকুল-পনঠুনি,
আর দু-দিন পরেই ক'ষে
বুঝি-বা তার দিদির
মতো সে-ও হবে গম্ভীর
কেবল পড়া করবে ব'সে।
আজ যতই ভোলে বানান,
আপনি ততই ওকে শানান
ব-ফলা ম-ফলায়,
আর যক্ষুনি নামতায়
ও একটুও আমতায়
তক্ষুনি জোর গলায়
হেঁকে বলেন, 'রুমি !
তোমার এখনও দুষ্টুমি !
করো শীঘ্রি মুখস্থ !'
দেখে বনেছি তাজ্জব,
তবে এও হ'লো সম্ভব—
আজ রুমিও ব্যস্ত !

এখন সময় বড়ো কড়া ;
আছে ইংরিজির পড়া,
আছে রিবন, জুতো, জামা,
সভ্যতা, ভব্যতা,
আছে ভদ্ররকম কথা ;
সময় নেই তো শুধু আমার।
তবে চক্ষু আরো বাঁকান,
আর বিদ্যে আরো শেখান,
কেন মিথ্যে ছড়া লেখা ?
আমি যাচ্ছি ফিরে সেই
আমার দূরের বাসাতেই,
সারা আকাশ ভ'রে একা।
ঐ তো রুমি ঘুমোয় ;
আমি শুধু একটি চুমোয়
তাকে ইচ্ছা দিয়ে যাই,
কাল জন্মদিনের ভোরে
যেন স্বপ্ন মনে প'ড়ে
উঠে আবছা বিছানায়
ভাবে, 'কে ছিলো এক্ষুনি ?
আমার নাম কে ডাকে শুনি ?
কই, আর তো শুনি না !
সত্যি কি তাহ'লে
গেলো আকাশ ভ'রে চ'লে
ঐ আমার পরি-মা ?'

পাপ্পার জন্মদিনে

পাপ্পা, আমার ছোট্ট উঠোনটিতে
ফুটেছিলো গোলাপ, চাঁপাফুল
অপ্‌রাজিতার নীল চোখের তলে
ঝুমকোলতার এলিয়ে-দেয়া চুল।
সূর্যমুখীর রং-মাখানো দিন,
জুঁই-ফোটানো সন্ধ্যারাতের ঘোর,
ঘুমের কালো নদীর মোহানায়
শিউলিফুলে শিউরে ওঠা ভোর।
সে-সব ফুল কী হ'লো, আজ তুমি
শুধাও যদি— কী দেবো উত্তর?
পাপ্পা, আমার শীতের অবেলায়
শুনতে কি চাও আলোর কলস্বর?
তখনো যে আকাশ ছিলো লাল,
ঘাসের মুখে শিশির ছলোছলো,
আলোর টানে যাদের আনাগোনা
না-দিয়ে কি পারি তাদের, বলো!
তখন যারা আমার কাছে এসে
চ'লে গেছে দণ্ড দুয়েক পরে,
কিংবা যারা পথে চলার ধুলো
মুছে গেছে আমার দাওয়ার 'পরে,
তাদের আমি দিয়েছি সব তুলে
দু-হাত ভ'রে অপ্‌রাজিতা, চাঁপা,
রক্তবরন উদ্ধত গোলাপ,
স্বপ্নময় শিউলি কাঁপা-কাঁপা।
এমনি ক'রে বিলিয়ে দিলাম সব
ভাবিনি তা তুচ্ছ কিংবা দামি,
তোমার জন্যে কিচ্ছু বাকি নেই,
বাকি আছি কেবলমাত্র আমি।

পাপ্পা, আমার ছোট্ট বারান্দায়
অনেকগুলো ছিলো পোষাপাখি,
সন্ধ্যা সকাল দুপুরবেলা ভ'রে
সারাটা দিন রঙিন ডাকাডাকি।
ছোট্ট চড়ুই, ফুর্তি তার কত
ভোরের বেলা আলোর জানালায়,
মধ্যদিনে ঠাণ্ডা ছায়া ফেলে
ঘুঘুর ডাকে কান্না ঝ'রে যায়।
উপচে পড়ে বুলবুলির শিস,
কোকিল তোলে উচ্ছ্বসিত তান,
যেন আমার আর কোনো কাজ নেই
কেবল হাওয়ায় বিলিয়ে দেবো গান।
সে-সব গান কী হ'লো, আজ তুমি
শুধাও যদি— কী দেবো উত্তর ?
পাপ্পা, আমার পাতা-ঝরার দিনে
কোথায় পাবো ফুলের খেলাঘর :
পাখিরা সব যে যার গান সেরে
মিলিয়ে গেলো দিনান্তের আলোয়,
গানগুলি সব ছড়িয়ে উড়ে গেলো
নানাদিকে, নানান পথের ধুলোয়।
জানি না আর তারপরে কী হ'লো,
হয়তো বা কেউ কুড়িয়ে নিলো ঘরে ;
বানের জলে ডুবলো বুঝি কত
হয়তো আবার জাগবে নতুন চরে।
সব হারিয়ে শূন্য হাতে আজ
তোমার কাছেই আস্তে এসে থামি,
তোমার জন্যে আর-কিছু তো নেই,
আছি এখন কেবলমাত্র আমি।

সরস্বতী পুজোর পদ্য

(টুটুর জন্য)

বলতে পারো সরস্বতীর মস্ত কেন সম্মান ?
বিদ্যে যদি বলো তবে গণেশ কিছু কম যান ?
সরস্বতী কী করেছেন ? মহাভারত লেখেননি,
ভাব দেখে তো হচ্ছে মনে তর্ক করাও শেখেননি।
তিন-ভুবনে গণেশদাদার নেই জুড়ি পাণ্ডিত্যে,
অথচ তাঁর বোনের দিকেই ভক্তি কেন চিত্তে ?
সমস্ত রাত ভেবে-ভেবে এই পেয়েছি উত্তর—
বিদ্যা যাকে বলি তারই আর-একটি নাম সুন্দর।

হাওয়ার গান

হাওয়াদের বাড়ি নেই, হাওয়াদের বাড়ি নেই,
নেই রে।
তারা শুধু কেঁদে মরে বাইরে।
সারা-দিন-রাত্রির বুক-চাপা কান্নায়
নিশ্বাস ব'য়ে যায় উত্তাল, অস্থির—
সে কোথায়, সে কোথায়, হায় রে।
বলে তারা, 'পৃথিবীর সব জল, সব তীর
ছুঁয়ে গেছি বার-বার দুর্বার ইচ্ছায়
তবু নেই, সে তো নেই, নেই রে।
সব জল, সব তীর, পাহাড়ের গম্ভীর
কন্দর, বন্দর, নগরের ঘন ভিড়,
অরণ্য, প্রান্তর, শূন্য তেপান্তর—
সব পথে ঘুরেছি বৃথাই রে।

পার্কের বেঞ্চিতে ঝরা পাতা ঝর্ঝর,
শার্সিতে কেঁপে-ওঠা দেয়ালের পঞ্জর,
চিমনির নিস্বনে, কাননের ক্রন্দনে
তার কথা কেবলি শুধাই রে।
তেমনি মিষ্টি ছেলে দোলনায় ঘুম যায়,
আবছায়া কার্পেট কুকুরের তন্দ্রায়,
ঘরে-ঘরে জ্ব'লে যায় স্বপ্নের মৃদু মোম—
সে-ই শুধু নিয়েছে বিদায় রে।
আঁধারে জাহাজ চলে, মাস্তুলে জ্বলে দীপ,
যাত্রীরা সিনেমায়, কেউ নাচে, গান গায় ;
আমরা তরঙ্গের বুকে হানি প্রশ্নের
অবিরাম নর্তন, মত্ত আবর্তন—
সে কোথায়, সে কোথায়, হায় রে !
অবশেষে থামে সব, ডেক হয় নির্জন,
অকূল অন্ধকারে ফেটে পড়ে গর্জন,
সমুদ্র ওঠে দুলে, বাঁকা চাঁদ পড়ে ঝুলে—
আমাদের বিশ্রাম নেই রে।
আমাদের বাড়ি নেই, দেশ নেই, শেষ নেই,
কেঁদে-কেঁদে মরি শুধু বাইরে,
বার-বার পারাপার যত করি, তবু তার
নেই, নেই, দেখা নেই, নেই রে !
সময় অন্তহীন, অফুরান সন্ধান,
বিশ্বের বুক ফেটে ব'য়ে যায় এই গান—
কোনখানে গেলে তারে পাই রে !
খুঁজে-খুঁজে ঘুরে ফিরি বাইরে,
সুরে-সুরে ব'লে যাই— নেই রে,
চিরকাল উত্তাল তাই রে।'